মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা
নভেম্বর-২০২৩ ঈসায়ী
রবি: সানি: জমা: আউ: ১৪৪৫ হিজরী
কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বাংলা

মস্কো ক্যাথেড্রাল মসজিদ
রাশিয়া

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

রেজি নং ডি.এ. ১৪২

৩য় পর্ব

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

নভেম্বর ২০২৩ ঈসায়ী

রবিঃ সানিঃ-জামাঃ আউঃ ১৪৪৫ হিজরী

কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বাংলা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক

প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী

সহযোগী সম্পাদক

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন বিন আবদুর নূর

ব্যবস্থাপক

চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক

মো : রমজান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম

মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)

আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন

প্রফেসর ডক্টর দেওয়ান আব্দুর রহীম

প্রফেসর ডক্টর মো. লোকমান হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন

ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

শাইখ আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী

শাইখ ইসহাক বিন ইরশাদ মাদানী

সম্পাদক
০১৭১৬-১০২৬৬৩
সহযোগী সম্পাদক
০১৭২০-১১৩১৮০
ব্যবস্থাপক :
০১৯১৬-৭০০৮৬৬

যোগাযোগ : মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৪৩৪ মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
ই-মেইল : tarjumanulhadeethbd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd
www.ahlahadith.net.bd
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

সার্কুলেশন বিভাগ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
বিকাশ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

মাসিক
তর্জুমানুল হাদীস
مجلة ترجمان الحديث الشهرية
مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক
রেজি নং ডি.এ. ১৪২

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠١٧١٦١٠٢٦٦٣
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي رحمه الله، المشرف العام للمجلة: الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق، رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور أحمد الله ترياشلي، مساعد التحرير: الشيخ مفضل حسين المدني.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৩০ ইউ.এস.ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০, ০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচীপত্র

দারসুল কুরআন
❖ **মুসলিমদের সবচেয়ে বড় শত্রু ইয়াহুদীরা।**..... ৩
শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী
দারসুল হাদীস
❖ **ডান হাতে পানাহার করার আদব।**.....৬
শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা
সম্পাদকীয়
❖ **ফিলিস্তিন : এক ভয়াল রক্তাক্ত জনপদ**.....৯
প্রবন্ধ :
❖ **একমাত্র আল্লাহর ইবাদত : তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ।**.....১০
মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান
❖ **শিশুর জন্যে মায়ের দুধ না গুড়োদুধ?।** ১৩
প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম
❖ **এমফিল ও পিএইচডি : গবেষণার প্রকৃতি ও পদ্ধতি।**....১৮
ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ
❖ **কুরআন-সুন্নাহর আলোকে চিন্তা ও বিষণ্নতা।**.....২১
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী
❖ **মুক্তমনা বনাম সুস্থ ভাবনা।**.....২৩
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব
❖ **সৃষ্টির আদী-অন্ত ঃ (শুরু থেকে লয়)।**.....২৭
মুহাম্মাদ রফিকুর রহমান
❖ **বিশ্ব নবী মোহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত হতে পেরে**.....৩০
অধ্যাপক মোঃ আবুল খায়ের
❖ **বিয়েভীতির প্রতিকার কোন পথে?।**.....৩২
মীযান মুহাম্মদ হাসান
❖ **ইসলামের সৌন্দর্য।**.....৩৪
সাইদুর রহমান
শুব্বান পাতা
❖ **যে সকল আমল মিজানের পাল্লা হালকা করে।**.....৩৯
মাযহারুল ইসলাম
❖ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল**.....৪৫

দারসুল কুরআন/مدروس القرآن

মুসলিমদের সবচেয়ে বড় শত্রু ইয়াহুদীরা

শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী*

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾

অনুবাদ, তুমি মানুষের মধ্যে মুসলিমদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী ইয়াহুদী ও মুশরিকদের পাবে আর সবার চাইতে মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্বে অধিকতর নিকটবর্তী পাবে যারা নিজেদেরকে খ্রিষ্টান বলে। কারণ এই যে, খ্রিষ্টানদের মধ্যে আলেম ও দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহঙ্কার করে না।[১]

আয়াতটি অবতরণের প্রেক্ষাপট : তাফসীরবিদদের আলোচনায় এসেছে যে, রাসূল ﷺ কেমন লোক ছিলেন, তাঁর কথাবার্তা এবং আচরণবিধি কেমন ছিল তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ইথিওপিয়ার বাদশা নাজাশী তাঁর নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। প্রতিনিধি দল রাসূল ﷺ-এর নিকট এলে তিনি তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শোনান। এতে তারা আল্লাহর প্রতি বিনম্র হয়ে কাঁদতে শুরু করে এবং ইসলাম কবুল করে। অতঃপর প্রতিনিধি দল নাজাশীর কাছে ফিরে পূর্বাপর ঘটনা বর্ণনা করে, এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আয়াতটি নাযিল করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : তাফসীরবিদগণ এ বিষয়েও একমত যে, যদিও আলোচ্য আয়াতটি সম্রাট নাজাশী ও তাঁর প্রেরিত প্রতিনিধি দল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্ত্বেও ভাষার ব্যাপকতার দরুণ অন্যান্য ন্যায়পরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ খ্রিষ্টানদের বেলায়ও এ আয়াতটি প্রযোজ্য। অর্থাৎ যারা ইসলাম পূর্বকালে ইঞ্জীলের অনুসারী ছিল এবং ইসলামোত্তর কালে ইসলামের অনুসারী হয়ে যায়। ইয়াহুদীদের মধ্যেও এ ধরনের কয়েকজন ছিল যারা এক সময় তাওরাতের অনুসরণ করত এবং ইসলাম আসার পর ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যায়। অন্যান্য সকল ইয়াহুদীদের অবস্থা ছিল বর্তমান কালের মতই। তারা সর্বদাই মুসলিমদের শত্রুতা ও মূলোৎপাটনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেই চলত। তাই আয়াতের শুরুভাগে ইয়াহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে :

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ অর্থাৎ, মুসলিমদের ব্যাপারে শত্রুতায় সর্বাধিক কঠোর ইয়াহুদীদেরকেই পাবে।

ইয়াহুদীদের মুসলিমদের সাথে যে ভীষণ শত্রুতা রয়েছে তার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে শয়তানী, বিরোধিতা ও অস্বীকার করার প্রবণতা রয়েছে এবং তারা জেনে শুনে কুফরী করে এবং জেদের বশবর্তী হয়ে অন্যায় আচরণ করে। তারা হকের মুকাবিলায় বিগড়ে যায়। হকপন্থী আলেমদের ওপর তারা ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায়। তাদের প্রতি হিংসা পোষণ করে। এ কারণে তারা বহু নারীকে হত্যা করেছিল। শেষনবী মুহাম্মদ ﷺ-কেও ইয়াহুদীরা (কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করুন) বহুবার হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। তারা তাঁর খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করে, তাঁর ওপর যাদু করে এবং তাদের ন্যায় দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ওপর আক্রমণ চালায়। অতঃপর আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى﴾

বন্ধুত্বের ব্যাপারে সবচেয়ে নিকটবর্তী ঐসব লোক, যারা নিজেদেরকে নাসারা বলে, যারা ঈসা ﷺ-এর সত্য অনুসারী এবং ইঞ্জীলের আসল ও সঠিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাদের মনে মোটের ওপর

---

* *সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও ভাইস প্রিন্সিপাল, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী-ঢাকা।*

[১] *সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৮২*

মুসলিম ও ইসলামের প্রতি মহব্বত আছে। এর কারণ এই যে, ঈসা আলাইহিস সালাম-এর ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার ফলে (বিকৃত হলেও) তাদের মধ্যে নম্রতা রয়েছে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে:

﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾

এবং তার (ঈসার) অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া।[২] তাদের কিতাবে নির্দেশ আছে, যে তোমার ডান গালে চড় মারে, তুমি তার সামনে তোমার বাম গালটিও এগিয়ে দাও। তাদের শরীয়তে যুদ্ধই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখানে তাদের বন্ধুত্বের কারণ এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে বহু ধর্মযাজক ও জ্ঞানপিপাসু আলেম রয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অন্যত্র বলেছেন :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ٥ هَاأَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; তারা তোমাদের অকল্যাণ সাধনে কোনো ত্রুটি করে না- তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে ওঠে। আর যা কিছু তাদের অন্তরে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেক বেশি ভয়ানক; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করছি, যেন তোমরা বুঝতে পার। দেখ! তোমরাই তাদের ভালোবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, তখন বলে 'আমরা ঈমান এনেছি'। পক্ষান্তরে তারা যখন আলাদা হয়ে যায় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে আঙুল কামড়াতে থাকে। তুমি বল, তোমরা আক্রোশে মরতে থাক নিশ্চয়ই আল্লাহ মনের কথা ভাল করেই জানেন।[৩]

আলোচ্য আয়াতসমূহে মুসলিমদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন স্বধর্মাবলম্বীদের ছাড়া অন্য কাউকে এমন মোড়ল ও উপদেষ্টারূপে গ্রহণ না করে, যার কাছে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য প্রকাশ করা যায় না।

ইসলাম বিশ্বব্যাপী স্বীয় করুণার ছায়াতলে মুসলিমগণকে অমুসলিমদের সাথে সহনুভূতি, মানবতা ও উদারতার নির্দেশ দিয়েছে। যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আচার-আচরণ একে কার্যে পরিণত করেও দেখিয়েছে। কিন্তু মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্যাবলী সংরক্ষণের স্বার্থে ইসলাম এ নির্দেশও দিয়েছে যে, ইসলামী আইনে অমুসলিম ও বিদ্রোহীদের সাথে সম্পর্ক একটি সীমার বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে না। কারণ, এতে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। এজন্যই মুসলিমদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও জাতিসত্তার হিফাযতের স্বার্থে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের শত্রুদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু কিংবা বিশ্বস্ত মুরুব্বীরূপে গ্রহণ না করার জন্য। উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াহুদী কিংবা খ্রিষ্টান, কপট বিশ্বাসী মুনাফিক হোক কিংবা মুশরিক বা আরো কোনো অমুসলিম- কেউ তোমাদের সত্যিকার হিতাকাঙ্ক্ষী নয়।

আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে সর্তক করে বলেছেন :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ যালিমদেরকে হিদায়াত করেন না।[৪]

[২] *সূরা হাদীদ আয়াত : ২৭*

[৩] *সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ১১৮,১১৯*

[৪] *সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৫১*

পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম ও তাফসীরবিদ ইমাম কুরতুবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে বলেছেন, 'বর্তমানকালে অবস্থা এমনভাবে পাল্টে গেছে যে, ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানকে বিশ্বস্ত ও নির্ভযোগ্যরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে এবং এভাবে ওরা মূর্খ বিত্তশালী ও শাসকদের ঘাড়ে চেপে বসেছে'। যার বাস্তবতা বর্তমানে সারা বিশ্বব্যাপী বিরাজমান। ইমাম কুরতুবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করে আমরাও বলতে চাই যে, শুধু ইয়াহুদী (যদিও এরা সবচেয়ে বেশি) আর খ্রিষ্টান নয়, বরং মুসলিমদের বিপরীতে গোটা পৃথিবীর সকল অমুসলিম এক। যদিও তাদের সকলের মাঝে বিভিন্ন ব্যাপারে যথেষ্ট মত-পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু মুসলিমদের সার্বিক ক্ষতি সাধনে সকলেই এক। এ মর্মেই রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : الكفر ملة واحدة কাফের তথা অমুসলিমরা একই সূঁতোয় গাঁথা। অথচ এ নির্দেশ ছিল মুসলিমদের ওপরে। আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

এ নির্দেশ অমান্য করে মুসলিমগণ শত-সহস্র দলে বিভক্ত হওয়ার কারণে তারা আজ শক্তিহীন। একজন আরবী কবি বর্তমান মুসলিমদের ব্যাপারে বলেছেন, এরা হল ডানা কাটা পাখির ন্যায়। তাই তো মুসলিমদের ওপর এতো যুলুম, নির্যাতন আর অত্যাচার। এ থেকে উত্তরণের জন্য মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ তাআলা মুসলিম জাতিকে হিফাযত করুন। ❑❑

আল্লামা মোহাম্মদ 'আবদুল্লাহিল ক্বাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

দা'ওয়াত ব্যতীত সংস্কার সম্ভব নয়, আবার প্রামাণ্য দলীল ব্যতীত দা'ওয়াত সম্ভব নয়, আর তাকলীদের পাশাপাশি দলীল অকার্যকর। সুতরাং অন্ধ তাকলীদের দ্বার রুদ্ধ এবং ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত করাই হবে সকল সংস্কার আন্দোলনের গোড়ার কথা।

আহলে হাদীস নির্দিষ্ট কোন দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুত ফির্কাপরস্তী ও দলবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্যই এটার উত্থান হয়েছে।

[আহলে হাদীস পরিচিতি]

গ্রাহক হওয়ার আহ্বান

"মাসিক তর্জুমানুল হাদীস"

পত্রিকার গ্রাহক/এজেন্ট হতে আগ্রহীদের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা গ্রাহক ফি ৩৬০/- (তিনশত ষাট টাকা) প্রেরণসহ। যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

যোগাযোগ:

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
মোবাইল : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮
বিকাশ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

পিডিএফ ফাইল পেতে নিম্নে ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

ফেসবুক পেইজ
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

ওয়েবসাইট
http://www.jamiyat.org.bd/

দৃষ্টি আকর্ষণ

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমল করে উন্নত জীবন গড়তে আগ্রহী? তাহলে আজই সংগ্রহ করুন এবং নিয়মিত পাঠ করুন- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণামূলক মুখপত্র "মাসিক তর্জুমানুল হাদীস" যাতে রয়েছে নিয়মিত প্রশ্নোত্তর বিভাগ। আপনার অজানা মাসআলা-মাসায়েল জানতে নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ প্রশ্ন করুন আমাদের ফাতাওয়া বিভাগে।

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা :
ফাতাওয়া বিভাগ
মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
৭৯/ক/৩ উত্তর যাত্রাবাড়ী-১২০৪।
ই-মেইল: tarjumanulhadeethbd@gmail.com

দারসুল হাদীস/من أحاديث الرسول

ডান হাতে পানাহার করার আদব

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা❖

عن عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ كُنْتُ غُلاَمًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَتْ يَدِى تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «يَا غُلاَمُ سَمِّ اللَّهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» . فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ .

'উমার ইবনু আবূ সালামাহ ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ছোট ছেলে অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাবার বাসনে আমার হাত ছোটাছুটি করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : হে বৎস! বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে আহার কর এবং তোমার কাছের থেকে খাও। এরপর থেকে আমি সব সময় এ নিয়মেই খাদ্য গ্রহণ করতাম।[৫]

রাবী পরিচিতি : নাম উমার ইবনু আবী সালামাহ। পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল আসাদ আল-মাখ্যূমী আলকুরাইশী। মাতা উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামাহ হিন্দ বিনতু আবী উমাইয়া আল-মাখ্যূমী। হিজরতের দুই বৎসর অথবা তার পূর্বে হাবাশাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে পালিত হন। কেননা তার পিতা আবূ সালামাহ ৩য় হিজরী সালে মৃত্যুবরণ করায় তার মাতা রাসূল ﷺ-এর সাথে যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ তখন তিনি নাবালেগ থাকার কারণে তিনি তার মায়ের সাথেই রাসূল ﷺ-এর পরিবারের সাথে যুক্ত হন এবং রাসূল ﷺ-এর কাছেই লালিত পালিত হন।

কর্মজীবন : তিনি নাবী ﷺ-এর সাথে খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আলী ﵁-এর খিলাফতকালে তিনি আলী ﵁-এর পক্ষে উষ্ঠের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর আলী ﵁ তাকে বাহরাইনের গভর্নর পদে নিয়োগ করেন। অতঃপর আলী ﵁ উক্ত পদে নু'মান ইবনু আজলান আয্যুরাকীকে নিযুক্ত করে তাকে স্থানান্তর করেন এবং তার প্রশংসা করে বলেন : তোমার পদ থেকে তোমাকে অপসারণ করেছি তবে তোমার কোনো দোষ নেই, তোমার ওপর কোনো অভিযোগ নেই। তুমি সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করেছ এবং আমানত রক্ষা করেছ। অতঃপর তাকে পারস্যের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেন।

হাদীস বর্ণনা : তিনি সরাসরি নাবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে তার মা উম্মু সালামাহ সূত্রেও নাবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তার নিকট থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন : স্বীয় ছেলে মুহাম্মাদ ইবনু উমর তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া আরো যারা তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা হলেন : সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর, আবূ উমামা ইবনু সাহল, ওয়াহাব ইবনু কাইসান, কুদামাহ ইবনু ইবরাহীম, সাবিত আল-বুনানী, ইয়াযীদ ইবনু উবাইদ আস-সা'দী প্রমুখ।

كُنْتُ غُلاَمًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم.

غُلاَمًا অর্থ, নাবালেগ শিশু। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে বালেগ হওয়ার আগ পর্যন্ত শিশুকে আরবী ভাষায় গোলাম বলা হয়।

فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ রাসূল ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। অর্থাৎ রাসূল ﷺ আমাকে তাঁর নিকট রেখে শিক্ষা দীক্ষা দিয়েছেন তাঁর নজরদারিতে রেখে স্বীয় সন্তানের মতো লালন পালন করেছেন।

উমার ইবনু আবী সালামাহ রাসূল ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে কিভাবে এলেন : উম্মুল মু'মেনীন উম্মু সালামাহ হিন্দ বিনতু উমাইয়ার পূর্ব স্বামী আবূ সালামাহ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল আসাদ আল-মাখ্যূমী ৩য় হিজরী সালে

❖ মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
[৫] সহীহ বুখারী, হা : ৫৩৭৬

মৃত্যুবরণ করলে তিনি নাবী ﷺ-এর শিক্ষানুযায়ী দু'আ পাঠ করেন :

إنا الله وإنا إليه راجعون

اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا.

অতঃপর তিনি হাদীসের অর্থের দিকে লক্ষ্য করে মনে মনে চিন্তা করেন আবূ সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর চাইতে ভালো কিছু আল্লাহ আমাকে আর কি দিবেন? অতঃপর আমার ইদ্দতকাল শেষ হওয়ার পর রাসূল ﷺ যখন আমার নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন তখন আমি ঘরে চামড়া দাবাগাত দিচ্ছিলাম। অতঃপর আমি আমার হাত ধৌত করে তাঁকে আমার ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিলাম। আর তাকে বসার জন্য একটি বিছানা দিলাম। তিনি তাতে বসলেন অতঃপর আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন। যখন তিনি তার কথা শেষ করলেন তখন আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল বিষয় তো এমন নয় যে, আমার মধ্যে আপনার প্রতি আগ্রহ নেই। তবে আমি এমন একজন মহিলা যে, আমার মধ্যে জিদ খুব বেশি, আমি এই আশঙ্কা করি যে, আপনি আমার মধ্যে এমন কিছু দেখতে পাবেন যার কারণে আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিবেন। আর আমার বয়সও অনেক হয়েছে এবং আমার সন্তানাদিও আছে। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন : তুমি যে জিদের কথা উল্লেখ করলে আল্লাহ অতিসত্বর তা দূর করে দিবেন, আর বয়সের বিষয় যা উল্লেখ করলে তাতো আমার বয়সও তোমার মতোই। আর সন্তানাদীর কথা যা বললে সে ব্যাপারে কথা হলো তোমার সন্তান আমার সন্তানের মতই। উম্মু সালামা বলেন : আমি রাসূল ﷺ-এর কথা মেনে নিলে তিনি আমাকে বিয়ে করলেন। উম্মু সালামাহ আরো বলেন : আল্লাহ তা'আলা আবূ সালামার পরিবর্তে তাঁর চাইতে উত্তম ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে আমাকে দান করলেন।[৬]

উক্ত হাদীস থেকে জানা যায়, নাবালেগ সন্তানওয়ালী কোনো বিধবা মহিলাকে বিবাহ করতে চাইলে তাকে সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করা উচিৎ নয়। বরং সন্তানদেরকে নিজ দায়িত্বে নিয়ে স্বীয় সন্তানদের মতো লালন পালন করা বাঞ্ছনীয়। এতে সন্তানের মাতা যেমন সন্তানদেরকে নিজের সাথে পেয়ে আনন্দিত হয়, পিতৃহারা সন্তানগণও আপন মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত না হয়ে আনন্দের সাথে জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। সেই সাথে কর্তব্য হল স্বীয় সন্তান ও স্ত্রীর আগের পক্ষের সন্তানের মধ্যে পার্থক্য না করে সবাইকে সুশিক্ষা প্রদান করা। এটাই আমাদের নাবী ﷺ-এর শিক্ষা।

وَكَانَتْ يَدِى تَطِيشُ فِى الصَّحْفَةِ.

খাবার থালাতে আমার হাত ছুটাছুটি করত। অর্থাৎ খাবার সময় আমার হাত থালার এক জায়গায় না থেকে থালার বিভিন্ন প্রান্তে চলে যেত। صَحْفَةٌ এমন বড় পাত্রকে বলা হয় যাতে একত্রে পাঁচজনে খাবার খাওয়া যায়।

يا غلام سم الله হে বৎস بسم الله বলে খাবার খাও। খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার হুকুম : অধিকাংশ আলেমগণের মতে খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। তবে একদল আলিম বলেন যে, বিসমিল্লাহ বলে খাবার শুরু করা ওয়াজিব। আর এটিই সঠিক। কেননা কেউ যদি শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায় তাহলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে بسم الله أوله وآخرة বলতে বলা হয়েছে।

بسم الله বলা যদি ওয়াজিব না-ই হত তাহলে স্মরণ হওয়া মাত্র তা বলার কোনো প্রয়োজন হত না। অতএব খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব।

وَكُلْ بِيَمِينِكَ ডান হাতে খাবার খাও। খাবার শুরুতে যেমন বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব, তেমন ডান হাতে খাবার খাওয়া এবং ডান হাতে পান করাও ওয়াজিব।

কেননা সকল আলিম ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ওযর ব্যতীত বাম হাতে খাবার খাওয়া এবং পান করা গুনাহের কাজ এবং এতে শয়তানের অনুসরণ করা হয়। তাই তো নবী ﷺ বাম হাতে খাবার খেতে ও পান করতে নিষেধ করেছেন। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

[৬] *মুসনাদ আহমাদ, হা : ১৬৩৪৪, ২৬/২৬২*

عن سالم عن أبيه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا .

সালিম তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্য হতে কেউ যেন বাম হাতে খাবার না খায় এবং উহা দ্বারা পান না করে। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে।[৭]

অতএব, জানা গেল যে, ডান হাতে খাওয়া ও পান করা ওয়াজিব। তবে ওযর থাকলে ভিন্ন কথা। সুতরাং ডান হাতে খেতে হবে এবং পান করতে হবে। তবে প্রয়োজনবশত বাম হাতের সহযোগিতা গ্রহণ করা যাবে। যেমন পানপাত্র যদি এতো বড় হয় তা এক হাতে ধরা সম্ভব নয় বরং দু'হাতে ধরতে হয় সেক্ষেত্রে ডান হাতের সাথে বাম মিলিয়ে ধরলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যেখানে পানপাত্র এক হাতে ধরা সম্ভব সেখানে বাম হাতে পাত্র ধরে ডান হাতের আঙুল দিয়ে তাতে ঠেক দেওয়া উচিৎ নয় এবং তাকে ডান হাতে ধরা বলাও যাবে না, বিধায় এমন অবস্থায় পান করলে এটা বলা যাবে না যে, আমি বাম হাতে পান করিনি বরং ডান হাতে পান করেছি। অথচ সে পাত্র ধরে রেখেছে বাম হাতে।

وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ এবং তোমার পার্শ্ব থেকেই খাও। অর্থাৎ থালাতে যখন একজাতীয় খাবার থাকবে তখন নিজের পার্শ্ব থেকেই খেতে হবে। অন্যের পার্শ্ব থেকে খাবার নেওয়া যাবে না। তবে একই থালাতে যদি বিভিন্ন ধরণের খাবার থাকে তখন নিজের রুচিমত যেদিক থেকে ইচ্ছা সে দিক থেকে খাবার নেওয়া যাবে। এ বিষয়ে সকল আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেন।

✡ উমার ইবনু আবূ সালামা رضي الله عنه-এর ভ্রাতাবৃন্দ : তার আরো ভাই ছিল, তারা হলেন; সালামাহ এবং মুহাম্মদ, বোন ছিল তিনজন : তারা হলেন, যয়নব, দুররাহ ও উম্মু কুলসুম।

[৭] *সহীহ মুসলিম, হা : ২০২০*

মৃত্যু : তিনি আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের খিলাফতকালে ৮৩ হিজরীতে মদীনাতে মৃত্যুবরণ করেন।

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ এরপর থেকে এটাই ছিল আমার খাদ্য গ্রহণের নিয়ম।[৮] অর্থাৎ রাসূল ﷺ আমাকে যেভাবে খাওয়ার পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন মৃত্যু পর্যন্ত আমি সে পদ্ধতিতেই আহার করেছি এর মধ্যে কোনো প্রকার ব্যতিক্রম করিনি।

হাদীসের শিক্ষা :

(১) বিধবা মহিলাদের বিবাহ করতে দ্বিধাবোধ না করা।

(২) বিবাহিত মহিলাদের বিবাহের ক্ষেত্রে তাকে তার সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন না করা।

(৩) ইয়াতিম সন্তানদের দায়িত্ব নিজ কাঁধে নিয়ে তাদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে নেয়া।

(৪) বিধবা মহিলার পূর্ব স্বামীর সন্তানদেরকে তার পিতার নামে ডাকা, অনুরূপভাবে দত্তক নেওয়া সন্তানদের তার বাবার নামে ডাকা।

(৫) বিধবা মহিলাকে বিবাহ করে তার সাথে মিলিত হবার পর তার পূর্ব স্বামীর কন্যা সন্তান বর্তমান স্বামীর জন্য চিরস্থায়ীভাবে হারাম হওয়া।

(৬) বিধবা মহিলার পূর্ব স্বামীর সন্তান ও বর্তমান স্বামীর অন্য স্ত্রীর সন্তানদের কোনো প্রকার রক্তের সম্পর্ক না থাকার কারণে তাদের বিবাহ বৈধ বিধায় তাদের পর্দা করা অবশ্যকভাবে পালনীয়।

(৭) খাবার শুরু করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা।

(৮) ওযর ব্যতীত ডান হাতে পানাহার করা আবশ্যক।

(৯) একই পাত্র থেকে একাধিক ব্যক্তির খাবার গ্রহণ করা।

(১০) নিজের সামনের দিক থেকে আহার করা।

(১১) একই থালাতে বিভিন্ন ধরনের খাবার থাকলে স্বীয় রুচি অনুযায়ী খাবার খাওয়া। ❑❐

[৮] *সহীহ বুখারী, হা : ৫৩৭৬*

সম্পাদকীয় : ফিলিস্তিন : এক ভয়াল রক্তাক্ত জনপদ : নিপাত যাক ইহুদী জায়নবাদ الافتتاحية

বর্তমান সভ্য পৃথিবীর সভ্য মানুষ দেখছে কী নির্মমতা আর নিষ্ঠুরতায় ফুটফুটে শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে। ইতিহাসের সর্বকালের সবচেয়ে ভয়ানক নিষ্ঠুরতম, নির্মম হত্যাকাণ্ড এটি। শিশুদের ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে মৃত মায়ের বুকের ওপর। কী বিভৎস এ দৃশ্য! বোমায় বিচ্ছিন্ন হাত পা-হীন ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে কাতরাচ্ছে ফুটফুটে শিশু। যার চাঁদের আলোর মত উজ্জ্বল চেহারাটি বুলেটের আঘাতে হয়ে গেছে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত। ঝরছে ওষ্ঠ বেয়ে টকটকে লাল রক্ত। আকাশ আজ শোকের অশ্রু ঝরাচ্ছে, বেদনায় নীল হয়ে গেছে পৃথিবীর সব বাতাস। প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে মরুর পর্বতশৃঙ্গসমূহ। মানবিকতা, মানবাধিকার জান্তার পায়ের বুটের তলায় শিশুর আর্তচিৎকার আর আর্তনাদে বিলীন হয়ে গেছে। মর্মন্তুদ নিষ্ঠুর হত্যালীলায় যে ভূমি আজ মৃত্যুপুরী, প্রতি মুহূর্ত ধ্বংস আর মৃত্যুর বিভীষিকা যেখানে ঘটছে, সেই জনপদের নাম ফিলিস্তিন। সেটিই মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিরাজ গমনের বিরতি স্থান, মুসলিম জাতির দ্বিতীয় কিবলা, তৃতীয় শ্রেষ্ঠ মসজিদ জেরুজালেমের বায়তুল মাকদিস 'মসজিদে আকসার' পুণ্যভূমি ফিলিস্তিন। ইহুদী জবরদখলদার ফ্যাসিস্ট নিষ্ঠুর মানবাধিকার ধবংসকারী ইসরাইল আমেরিকা ও পশ্চিমাদের সহযোগিতায় নিজ দেশে উদ্বাস্তু বানিয়ে ফিলিস্তিনিদের ওপর চালাচ্চে এ নির্মমতা ও নিষ্ঠুর গণহত্যা। তাদের নিষ্ঠুরতার শিকার হচ্ছে নিরীহ নিরপরাধ ফিলিস্তিনের নারী ও শিশুরা। প্রতিদিন চলছে এ নারকীয় হত্যাকাণ্ড। নিজ দেশ থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে ফিলিস্তিনীদের। ২০২৩ সনের সভ্য পৃথিবীর মানুষ এ অমানবিক নিষ্ঠুরতা দেখে যাচ্ছে নীরবে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত সেখানে চলছে এ অমানিক পাশবিকতার হত্যার খেলা। চলছে নিজভূম থেকে বিতাড়িত করার নারকীয় তাণ্ডব। বছরের পর বছর, মাসের পর মাস, দিনের পর দিন বারুদের গন্ধ আর বোমাবিস্ফোরণের আওয়াজে যাদের রজনী ভোর হয়, আঁধার শেষে আলো আসে, কিন্তু ফিলিস্তিনীদের আঁধার কাটে না। জমতে থাকে ক্ষোভ। ফিলিস্তিনিদের জমা ক্ষোভ বিস্ফোরিত হয় হামাসের রকেট হামলার মাধ্যমে। হামাস রকেট হামলা করে ইসরাইলের ওপর। ইসরাইল কেঁপে ওঠে। আর এ হামলার প্রতিশোধ নিতে কিয়ামতের ভয়াবহতায় সর্বকালের ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হত্যায় মেতে ওঠে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে নেমে পড়ে নিরস্ত্র নারী-শিশু নির্বিচারে হত্যার ভয়ঙ্কর উৎসবে। এ লেখা পর্যন্ত চলছে এ হত্যার খেলা, মরছে প্রতিদিন অসংখ্য নারী-শিশু এবং ফিলিস্তিনের যুবকেরা। সারি সারি ফিলিস্তিনি শিশুদের লাশ দেখে বেদনার অশ্রু ছেড়ে কেউ একজন ফেইসবুকে চিৎকার করে বলছেন- হে সমগ্র বিশ্ববাসী! হে বিশ্বের মুসলিমেরা; কোথায় তোমাদের বিবেক! কোথায় আজ ফিলিস্তিনবিজেতা গাজী সালাহউদ্দিন! এরা কিন্তু আমাদেরই সন্তান, এ পৃথিবীতে এদেরও বসবাস করার অধিকার ছিল। যেমন তুমি তোমার সন্তানকে নিয়ে বসবাস করছো তোমার নিজ ভূমে। আর কতদিন এভাবে ফুলের মতো শিশুদের মৃত্যু দেখবে? মুসলিম বিশ্বকে ডেকে বলছে: হে মুসলিম বিশ্বের শাসকেরা! তোমাদের সন্তানদের যদি ইহুদীরা এভাবে শেষ করে দেয়, তোমাদের জানাযা পড়ানোর ও তোমাদেরকে গোরে নামানোর কেউ থাকবে না। কে তোমাদের ভূমে আজানের ধ্বনি দেবে? এ আর্তচিৎকার যথার্থ। আজ বিশ্ব মুসলিম এ নিষ্ঠুরতা দেখেও কার্যকর কোনো ভূমিকা নিচ্ছে না। ফিলিস্তিনিদের পাশে এসে যে শক্তি নিয়ে দাঁড়ানো প্রয়োজন ছিল তা আমরা দেখছি না। সত্যিই এটি বড় বেদনাদায়ক।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এ নিষ্ঠুরতার তীব্র প্রতিবাদ ও ঘৃণা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক তাঁর একাধিক বক্তব্যে নির্মম এ হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। 'আমরা নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের পাশে। আমরা ফিলিস্তিনিদের নিজভূমে স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করে অন্যান্য জাতির মতো স্বাধীনভাবে বাঁচার লড়াইকে সমর্থন করি'- মর্মে তিনি বিবৃতি দিয়েছেন। বাংলাদেশের সরকার ও প্রতিটি নাগরিক ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য লড়াইকে সমর্থন করে। আজ হয়ত গাজী সালাউদিন আউয়ুবী আসবেন না, তবে আমরা বিশ্বাস করি, একদিন ফিলিস্তিনীদের এ অমানিশার অন্ধকার কেটে যাবে। একদিন তারা অবশ্যই বিজয়ী হবে, প্রতিষ্ঠিত হবে স্বাধীন ফিলিস্তিন, ইন শা আল্লাহ। আমরা এটাও জানি যে, মহান আল্লাহর সাহায্য আসলে অত্যাধুনিক মিসাইল, ক্ষেপণাস্ত্র, আধুনিক যুদ্ধবিমান, আয়রন ডোম কোনোটিই কাজে আসবে না। মজলুম জনতা বিজয়ী হবেই হবেই। কিন্ত পাশাপাশি নিজেদেরকেও শত্রু মোকাবিলায় হওয়া প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিতে বলীয়ান। আমরা আল্লাহর নিকট ফিলিস্তিনিদের জন্য দু'আ করছি, হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে হেফাযত করুন। তাদেরকে আপনার গায়েবী মদদে সাহায্য করুন। শত্রুর হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন, আমীন। ❐❑

একমাত্র আল্লাহর ইবাদত : তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ

মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্ফান*

(পূর্ব প্রকাশের পর)

ষষ্ঠ অধ্যায়–

কতিপয় শিরকী কর্মকাণ্ডের বর্ণনা

১। তাবীজ-কবচ–

মূলত তাবীজ-কবচ ব্যবহার করা হারাম :

যে ব্যক্তি সুতা, তার বা বালা তাবীজ হিসেবে ঝুলাবে বা সেগুলো সন্তান-সন্ততি, জীব-জন্তু, গাড়ী ইত্যাদিতে ঝুলাবে, এ দ্বারা যদি বিশ্বাস রাখে যে নিশ্চয়ই এগুলো স্বয়ং লাভ অথবা ক্ষতি করে দেয় আর এর ওপর ভরসা রাখে ও নির্ভর করে তবে সে বড় শিরককারী হিসেবে পরিগণিত হবে। আর যদি বিশ্বাস করে যে এগুলো নিছক একটি মাধ্যম-অসীলামাত্র তবুও সে ছোট শিরককারী হিসেবে গণ্য হবে।

এর ওপর নিম্নের হুকুম প্রযোজ্য–

(ক) যে ব্যক্তি শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতার কারণে তাবীজ হিসেবে সুতা বা অন্য কিছু ঝুলাবে সেটি শিরকের অন্তর্ভুক্ত, যা তার উপকারের চেয়ে অধিক ক্ষতিকারক যদি তাতে কোনো উপকার থাকে প্রকৃত পক্ষে তাতে কোনো উপকার নেই। অতএব সুতা বা অন্য কিছু যা ঝুলানো হয়েছে তা সরিয়ে ফেলা জরুরি। যদি সে এ অবস্থায় মরে যায় তবে সে কখনও মুক্তি পাবে না। কেননা ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে রয়েছে–

أَنَّ النَّبِيَّ أَبْصَرَ عَلَى عَضُدِ رَجُلٍ حَلْقَةً أُرَاهُ قَالَ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ وَيْحَكَ مَا هَذِهِ قَالَ مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا انْبِذْهَا عَنْكَ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا

অর্থাৎ নবী (ﷺ) এক ব্যক্তির বাহুতে জণ্ডিসের কারণে একটি বালা দেখতে পেলেন। তখন তিনি বলেন– ধ্বংস হও তুমি। কী এটি? সে বলল– এটি তো দুর্বলতার জন্য। তিনি বললেন, জেনে রাখ এটি কিন্তু তোমার দুর্বলতা বৃদ্ধিই করে যাবে, তোমার শরীর হতে তা ফেলে দাও, কেননা মৃত্যুবরণ করা অবস্থায়ও যদি এটি তোমার সাথে থাকে কখনো তুমি মুক্তি পাবে না।[৯]

অনুরূপ কেউ যদি বালা মুসীবত আসার আগে তা প্রতিহত করার জন্য তাবীজ লটকায় বা বালা মুসীবতে পতিত হওয়ার পর তা দূর করার জন্য লটকায় তবুও তাতে তার শিরকে পতিত হওয়ার ফলে ক্ষতিই বৃদ্ধি পাবে যা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

(খ) যে ব্যক্তি তাবীজ ঝুলায় তার ওপর নবী (ﷺ) বদদোয়া করেছেন যে, তার উদ্দেশ্য যেন পূর্ণ না হয় এবং সে যেন আরাম না পায়। যেমন উকবা বিন আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসে নবী (ﷺ) বলেন–

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো তাবীজ-কবচ ঝুলাবে আল্লাহ যেন তার উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেন, যে ব্যক্তি কোনো শান্তি কবচ ঝুলাবে তাকে যেন আল্লাহ আরাম শান্তি না দেন।[১০]

(গ) যে ব্যক্তি তাবীজ ঝুলাবে তা কেটে ফেলা জরুরি, যদিও তা কোনো জন্তু, বাহন বা অন্য কিছুতে হয়। আবূ বাশীর আল আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে–

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ رَسُولًا أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ .

অর্থাৎ তিনি কোনো এক সফরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে ছিলেন। আব্দুল্লাহ বলেন– আমি ধারণা করেছি যে, তিনি বলেছেন, ঐ সময় জনগণ রাত্রি যাপন করছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ মর্মে একজন প্রতিনিধি পাঠালেন যে, কোনো উটের গলায় তার বা সুতার মালা থাকলে তা যেন কেটে দেয়া হয়।[১১]

(ঘ) তাবীজ ঝুলান শিরক যার বিস্তারিত আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

---

* *দাঈ, গারবু দিরা দাওয়া সেন্টার, সৌদি আরব ও সহ-সভাপতি, প্রবাসী শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[৯] *আহমাদ ও ইবনে মাজাহ– হাসান*
[১০] *আহমাদ, আবূ ইয়ালা, হাকেম– সহীহ*
[১১] *সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম*

যেমন ইবনে মাসউদ ﵁ হতে বর্ণিত হাদীসে নবী ﷺ বলেন–

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই হারাম ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ-কবচ ও তেওয়াল (যা মোহাব্বত সৃষ্টি করবে এমন কিছু) ব্যবহার করা শিরক।[১২]

(ঙ) যে ব্যক্তি তাবীজ বা অন্য কিছু ঝুলায়, আল্লাহ তাকে তার প্রতি সোপর্দ করে দেন। আর আল্লাহ ছাড়া যদি সে অন্যের প্রতি সোপর্দ হয় তবে সে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। আব্দুল্লাহ বিন হাকীম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবী ﷺ বলেন–

مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো কিছু ঝুলায় বা ঝুলে যায়, তাকে তার দিকেই সোপর্দ করা হয়।[১৩]

(চ) যে ব্যক্তি তাবীজ হিসেবে কোনো মালা পরলো, মুহাম্মাদ ﷺ নিশ্চয়ই তার থেকে মুক্ত। যেমন নবী ﷺ-এর বাণী–

يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَخْبِرْ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ .

অর্থাৎ হে রুয়াইফ! সম্ভবত তুমি দীর্ঘায়ু পাবে আমার পর, সুতরাং তুমি জনগণকে খবর দাও, যে ব্যক্তি তার দাড়িতে গিরা লাগাবে বা গলায় তারের মালা-বালা লটকাবে বা জন্তুর মল বা হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবে নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ তার থেকে মুক্ত।[১৪]

তাবীজ কবচের প্রকারভেদ

তাবীজ দুই প্রকার–

প্রথম প্রকার– কুরআন ও হাদীস বহির্ভুত তাবীজ-কবচ। যেমন– তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে, তামা, লোহা, হাড়, কড়ি, পূতি, সুতা, তার ইত্যাদি দ্বারা ব্যবহৃত তাবীজ-কবচ। এ ধরনের তাবীজ-কবচ শিরক, যেমন ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। নবী ﷺ বলেন–

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ .

অর্থাৎ নিশ্চয়ই হারাম ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ-কবচ ও তেওয়ালাহ অর্থাৎ ভালবাসা সৃষ্টিকারী জিনিস শিরকের অন্তর্ভুক্ত।[১৫] এ হুকুমের ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম একমত।

দ্বিতীয় প্রকার– কুরআন ও হাদীস সম্বলিত। যেমন, গলায় কোরান ঝুলান, বা বদ নজর প্রতিহত করার জন্য গাড়ি ও বাড়িতে কুরআন রাখা, বা বিপদাপদ যেন না আসে এজন্য বাড়িতে সূরা ফালাক, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি ঝুলান, বা নবীর কোনো দোয়া কাগজে লিখে বুকে লাগানো বা বিপদাপদ বদ নজর থেকে রক্ষা পাওয়া বা প্রতিহত করার জন্য নবীর ﷺ দোয়া-জিকির লেখা বোর্ড বাড়িতে ঝুলিয়ে রাখা ইত্যাদি সব কিছুই তাবীজের অন্তর্ভুক্ত যা নিষেধ হওয়া সম্পর্কে দলীল-প্রমাণ এসেছে সুতরাং এগুলো নিষেধ। যেমন নবী ﷺ বলেছেন–

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই অবৈধ ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ ও ভালবাসা সৃষ্টি করার বস্তু তেওয়ালা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।[১৬]

কিন্তু তাবীজ যদি কুরআন থেকে হয় তবে তা ঝুলান শিরক হবে না, কেননা কুরআন হলো আল্লাহর কালাম, কোনো সৃষ্টি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে তা নিষেধের অন্তর্ভুক্ত, কেননা সাধারণভাবে তার নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত আর আলেমদের মতামতের মধ্যে এটিই হলো গ্রহণযোগ্য।

হে আল্লাহর বান্দা! নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন–

১। তাবীজ কেটে ফেলা আপনার জন্য জরুরি, সুতরাং আমাদের কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে তাবীজ ঝুলাতে দেখে তবে নিজের ক্ষতি বা বিপদের আশঙ্কা মুক্ত হলে তা কেটে ফেলা উচিত।

২। মুসলমানদের শাসকের উচিত কিছু লোককে তাবীজ কাটা এবং শিরক ও শিরকের ওসীলাসমূহকে উচ্ছেদ করার জন্য নিযুক্ত করা এবং তাদেরকে জনগণের মধ্যে এ জন্য পাঠান। কেননা এটি হবে ইসলামের অন্যতম আদর্শ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ এর অন্তর্ভুক্ত। আবূ

[১২] *আহমাদ ও আবূ দাউদ– সহীহ*
[১৩] *তিরমিযী ও আহমাদ– সহীহ*
[১৪] *আবূ দাউদ, নাসায়ী– সহীহ*
[১৫] *আহমদ ও আবূ দাউদ*
[১৬] *আহমাদ, ও আবূ দাউদ– সহীহ*

বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে আছে–

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ رَسُولًا أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ.

অর্থাৎ তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে কোনো এক সফরে ছিলেন। আব্দুল্লাহ বলেন– আমি ধারণা করি যে তিনি বলেন– জনগণ এমতাবস্থায় রাত্রি যাপন করেছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ মর্মে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন যে, কোনো উটের গলায় ঘণ্টা অবশিষ্ট থাকলেই তা কেটে দিতে হবে।[১৭]

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾

অর্থাৎ (এরা হল) যাদেরকে আমি যমীনে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে ও মন্দ কাজে নিষেধ করবে, সকল কাজের শেষ পরিণাম (ও সিদ্ধান্ত) আল্লাহ্‌র হাতে নিবদ্ধ।[১৮]

৩। আপনার উচিত আপনি জনসাধারণকে তাবীজ-কবচের হুকুম সম্পর্কে বর্ণনা দিবেন যেমন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বর্ণনা করেন যে তা অবশ্যই একটি শিরক। তা তাবীজ ব্যবহারকারীর জন্য ক্ষতি বৃদ্ধি ছাড়া কোনো উপকারে আসবে না। মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাবীজ ব্যবহারকারী হতে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং যে তা ব্যবহার করবে আল্লাহ তাকে তার দিকেই সোপর্দ করবেন সুতরাং সে একজন ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। আর সঠিক কথা হলো তা অবশ্যই নিষিদ্ধ যদিও তা কুরআন থেকে হয়। তা কেটে ফেলা জরুরি, তা থাকা অবস্থায় সে যদি মৃত্যুবরণ করে তবে সে কখনোও মুক্তি পাবে না।

৪। আপনি তাবীজ ঝুলানো ও ব্যবহার করা হতে সতর্ক হোন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাবীজ ব্যবহারকারীর ওপর বদ দোয়া করেছেন, আল্লাহ যেন তার উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেন, আল্লাহ যেন তাকে শান্তি না দেন।[১৯]

যাতে আপনি ঐ বদদুয়ায় পতিত না হোন সুতরাং আপনি কি মনে করেন স্বয়ং নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যার জন্য বদ দোয়া করেন যে, আল্লাহ যেন তার উদ্যেশ্য পূর্ণ না করেন এবং সে যেন আরাম ও শান্তি না পায় (এটি কি) তুচ্ছ মনে করেন?

৫। হে মুসলিম, আপনি মৃত্যুর পূর্বেই আপনার ঝুলান ও ব্যবহার করা তাবীজ দ্রুত কেটে ফেলুন, কেননা তা থাকা অবস্থায় আপনি মৃত্যুবরণ করলে মুক্তি পাবেন না।

৬। হে প্রত্যেক সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্তগণ! আপনাদের উচিত তাবীজ ব্যবহারকারীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করা এবং তা কেটে দেয়া, তার হুকুম সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা আবশ্যক। অন্যদের পূর্বে এটি আপনাদের প্রতি অপরিহার্য দায়িত্ব। হে মুসলিম ভাইয়েরা আপনারাও এ ব্যাপারে দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাহায্য করুন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى البر والتقوى﴾

(অর্থাৎ) এবং সৎকাজ ও তাক্বওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা কর।[২০]

৭। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সাধ্যমতো শিরক ও শিরকের ওসীলাগুলোকে প্রতিহত করা। অতএব, যারা রাস্তা-ঘাটে বসে থাকেন তাদের উচিত হবে যাদেরকে গাড়িতে (বা শরীরে) তাবীজ ঝুলাতে দেখবেন তা কেটে দেয়া। অনুরূপ প্রত্যেক মুসলমান যার সামর্থ্য আছে তাবীজ কেটে দেয়ার সে যেন তা কেটে দেয় আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশায় ও মুসলিম উম্মতের হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে।

তাবীজ-কবচ কুরআন থেকে হলেও তা নাজায়েয হওয়ার তিনটি কারণ– (১) তাবীজ ব্যবহার নিষেধ হওয়া সম্পর্কে যত হাদীসে বর্ণনা হয়েছে তাতে আমভাবে সমস্ত তাবীজের কথা বুঝানো হয়েছে, কুরআন থেকে হলে তা খাসভাবে জায়েয হওয়ার কোনো দলীল বর্ণনা হয়নি। (২) কুরআনের আয়াত বা সূরা দ্বারা তাবীজ হলে তাতে কুরআনের নানাভাবে অবমাননা হয়, যেমন– তাসহ পায়খানায় প্রবেশ, সহবাস ইত্যাদি। (৩) কুরআন দ্বারা তাবীজ ব্যবহার শুরু হলে অন্যান্য তাবীজও অবাধ ও সাধারণভাবে চালু হয়ে যাবে, তাই সে পথও বন্ধ করা জরুরি। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।[২১]

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

---

[১৭] *সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম*
[১৮] *সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত : ৪১*
[১৯] *আহমাদ*
[২০] *সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ২*
[২১] *অনুবাদক– ইবনু আফফান*

শিশুর জন্যে মায়ের দুধ না গুঁড়োদুধ?

প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম*

বিশ্বের মানচিত্রে ৫৪ হাজার বর্গমাইল প্রিয় আমাদের এই মুসলিম অধ্যুষিত মাতৃভূমিতে আশ্চার্যজনকভাবে সত্য যে ৪৬ টি ব্র্যান্ডের রেজিস্টার্ড শিশু খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে। দেশের ১৭ কোটি মানুষের বাজারে নকল, ভেজাল, নিম্নমানের ও ক্ষতিকারক খাদ্যদ্রব্যসহ নানাবিধ পণ্যের উপস্থিতি হতাশাজনকভাবে পীড়াদায়ক। দেশটির বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ পেটের চিন্তায় ব্যস্ত, তদুপরি জনগণের মধ্যে শিক্ষা সাংস্কৃতির মান নিচু এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিষ্ক্রিয়তার ফলে দেশী ও বিদেশী কোম্পানীগুলো এখানে নিম্নমানের পণ্য বিপনন করতে সাহস পাচ্ছে। স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক খাদ্য সামগ্রী অবাধে বিক্রি ও বাজারজাত করা হচ্ছে। আমাদের রাজনীতি যদি জনস্বার্থে সত্যিকার অর্থে হতো তাহলে পরিস্থিতির চিত্রটি এমনটি হতোনা। জনবহুল এ দেশে অসংখ্য অনিয়ম। অনেক ক্ষেত্রে সরকারী কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

মেলামিন মিশ্রিত দুধ ১-২ বার খেলে তেমন ক্ষতি না হলেও বেশিদিন খেলে কিডনী নষ্ট হয়ে যায়। মুনাফার জন্য শিশুদের মেরে ফেলা কিংবা জাতির মেধা-নাশ করা কত যে জঘন্য অপরাধ সেটা কি এ কাজে জড়িত ব্যবসায়ীগণ ভেবে দেখেছেন? এই ভেজাল ও দুষিত গুঁড়া দুধ যে শুধু শিশুরাই খাচ্ছে তা নয় বরং বড়রাও তা খাচ্ছে।

আমরা শিশু খাদ্য হিসাবে কখনোই গুঁড়ো দুধকে সমর্থন করিনা। শিশুদের জন্য আলাহ তা'আলা মাতাকে পর্যাপ্ত দুধ সরবরাহের ক্ষমতা দিয়েছেন। গবেষকগণ প্রমাণ করে দেখেছেন একজন মা দৈনিক ৮৫০ মিলি লিটার (এম এল) দুধ তৈরি করতে সক্ষম। এটা অবশ্যই অলৌকিকভাবে আল্লাহর দান। তাই বিশেষজ্ঞগণ বলেন, জন্মের প্রথম ৬ মাস পর্যন্ত মায়ের দুধই শিশুর জন্য যথেষ্ট। শিশুর বয়স ৬ মাস পেরিয়ে গেলে মায়ের দুধের পাশাপাশি ফলের রসের সাথে পানি মিশিয়ে হালকা করে খাওয়াতে হবে। ধীরে ধীরে রান্না করা ডালের উপরের তরল অংশ, শাক রান্না করার সময় এর তরল অংশ এগুলোতে পানি মিশিয়ে পাতলা করে শিশুকে খাওয়াতে হবে। অতঃপর পাকা কলা, পেপে কিংবা অন্য কোনো নরম ফল চটকে বা পিষে শিশুকে খেতে দিতে হবে। পরবর্তীতে সুজি, চালের গুঁড়া রান্না করে, খিচুরী তৈরি করে এবং ডিমের কুসুম নরম করে শিশুকে খাওয়ানোর অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

আর কুরআনে মহান আল্লাহ সূরা আল বাকারার ২৩৩ আয়াতে বলেছেন, ''ওয়াল ওয়ালিদাতু ইয়ুরজিনা আওলাদাহুন্না হাওলাইনি কামিলাইনি'' অর্থ : মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর বুকের দুধ খাওয়াবে। (২ : ২৩৩) সূরা আল কাসাস ৭ আয়াতে উল্লেখ আছে, ''ওয়া আওহায়না ইলা উম্মি মূসা আন আরজিয়ীহ'' অর্থ : ''আমি মূসার জননীকে আদেশ করলাম যে তাকে বুকের দুধ খাওয়াতে থাক'' (২৮ : ৭)। সূরা লোকমানের ১৪ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, ''হামালাতহু উম্মুহূ ওয়াহনান 'আলা ওয়াহনিওঁ ওয়া ফিসালুহূ ফী আমাইনি আনিশকুরু লী ওয়ালি ওয়ালী দায়েক'' অর্থ : মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়াতে দু'বছর লাগে, আমার প্রতি ও তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও'' (৩১ : ১৪)। সূরা আল আহকাফ ১৫ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন, ''হামালাতহু উম্মুহূ কুরহাওঁ ওয়া ওয়াজা'য়াতহু কুরহান ওয়া হামলুহূ ওয়া ফিসালুহূ সালাসূনা শাহরান'' অর্থ : তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট করে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তাকে বুকের দুধ ছাড়াতে সময় লেগেছে ৩০ মাস'' (৪৬ : ১৫)। পবিত্র কুরআনে সূরা আত-তালাক ৬ আয়াতে আছে'' যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে বুকের দুধ দেয় তবে তাদেরকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেবে..'' (৬৫ : ৬)।

উপরে বর্ণিত আল-কুরআনে আল্লাহর নির্দেশগুলো ছাড়াও আরো কয়েকটি সূরায় মায়ের দুধ সম্পর্কে বিভিন্নভাবে এবং নানা প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে, যেমন : সূরা আন-নিসা ২৩ আয়াত, সূরা হাজ্জ ২ আয়াত, সূরা আল-কাসাস ১২ আয়াত এবং সূরা আল-বালাদ ১০ আয়াত। এখানে উল্লেখ্য যে, সূরা আল-বালাদ ১০ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ''ওয়া হাদায়নাহুন নাজদাইন'' অর্থ : আমি কি তাকে দু'টি পথই দেখাইনি''? এক্ষেত্রে ইবনে কাসীর এই অর্থ করার পর ব্যাখ্যায় লিখেছেন সাহাবী ও অন্যান্য তাফসীরকারদের বরাত দিয়ে যে, নাজদাইন বলতে দুই নাজদ দ্বারা দুই স্তনকে বুঝানো হয়েছে।

চীন দেশে মুরগীর ডিমেও মেলামিন পাওয়া গেছে। কারণ হলো মুরগীর খাবারে মেলামিন মিশ্রিত করা হয়ে থাকে।

* *সহ-সভাপতি : বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

আমরা মুরগী ও গাভীর জন্য যে খাবার খাওয়াচ্ছি সেখানেও থাকতে পারে মেলামিন জাতীয় বিষ। যার ফলে ডিম ও দুধে মেলামিন থাকাটাই স্বাভাবিক। এমনিতেই বাংলাদেশে ভেজাল ও নকলের সয়লাব। মশলায় ভেজাল, জুসে ভেজাল, ফার্স্ট ফুডে ভেজাল, হোটেলে যবেহ পূর্ব মরা মুরগী দিয়ে রসনাতৃপ্ত, পঁচা ডিম দিয়ে কেক-রুটি তৈরি, বিষাক্ত মবিল দিয়ে জিলাপি ও চানাচুর তৈরি, ঔষধে ভেজাল, রডে ভেজাল, এটেল মাটিকে সিমেন্ট হিসেবে চালিয়ে দেওয়া এভাবে দেশে সর্বত্র ভেজাল নকলের অমার্জনীয় ব্যাপক প্রতিযোগিতা চলছে। দেশে ডায়াবেটিস ও কিডনী রোগ বৃদ্ধির কারণ ভেজাল খাদ্য গ্রহণ বলে বিশেষজ্ঞগণ গবেষণায় উল্লেখ করেছেন। শাকসব্জিতে কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার, ফলের মধ্যে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো, মাছে ফরমালিন, মুড়িতে ইউরিয়া সার প্রয়োগ, পোড়া মবিল দিয়ে মুখরোচক খাদ্য তৈরি, ভেজাল জাতীয় ফার্স্ট ফুড প্রস্তুতির জন্য ইদানিং শিশুদেরও ডায়াবেটিস টাইপ-১ দেখা দিচ্ছে। ফলে এদেরকে ইনসুলিন ইনজেকশন নিয়ে সারা জীবন কাটাতে হবে। ভেজাল খাদ্যদ্রব্যের জন্য অকালে চুল পেকে যাচ্ছে। এই অবস্থায় আমাদের দেশে একটি ''ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'' (FDA) উন্নত বিশ্বের মতো থাকা সময়ের দাবি। সরকার জনগণ ও মিডিয়া এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারে।

আমাদের দেশের সরকার যদি গুঁড়ো দুধ আমদানি একেবারেই বন্ধ করে দেয় তাহলেও নিশ্চিত করে বলা যাবে এর জন্য একটি শিশুও না খেয়ে থাকবে না। মনে রাখতে হবে, যে সমস্ত দেশ থেকে বাংলাদেশ গুঁড়ো দুধ আমদানি করে ঐসব দেশের শিশুদেরকে গুড়ো দুধ খাওয়ানো হয় না। তারা তরল দুধ খাওয়ায়। সুতরাং গাভী ও ছাগী পালনের মাধ্যমে আমাদের দেশের সম্পদ দিয়েই শিশুর খাবার নিশ্চিত করা যাবে। গরু-ছাগল পালন বাড়ানোর ব্যাপারে দেশের জনগণকে আরো সচেতন ও উৎসাহী করে তুলতে হবে। অপ্রিয় সত্য কথা বলতে কি, আমরা গরু ও কুকুরের চেয়ে খারাপ হয়ে যাচ্ছি, কারণ গাভী ও মাদি কুকুর তাদের বাচ্চাদেরকে তাদের দুধ দেয়, কিন্তু আমরা আশরাফুল মাখলুকাত সৃষ্টির সেরা হয়েও আমাদের মায়েরা বিশেষ করে শহরের মাতাগণ নিজেদের বাচ্চাদেরকে বুকের দুধ দিতে চায় না।

বিজ্ঞানীদের মতে, দুধের মতো সাদা রং-এর মেলামিন হচ্ছে দেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক এক প্রকারের প্রোটিন। দুধে পানি মেশালে যাতে দুধ পাতলা না হয়ে বরং ঘন হয় তাই মেলামিন দুধের সাথে মেশানো হয়। চটকদার বিজ্ঞাপনে মুগ্ধ হয়ে মা-বাবারা সন্তানদের অতিরিক্ত পুষ্টির বিবেচনায় মায়ের দুধের পাশাপাশি চড়া দামে ক্রয় করে। এই ভেজাল ক্ষতিকারক ও অপ্রয়োজনীয় খাবার মিষ্টি জাতীয় নানা রসালো খাদ্যদ্রব্য তৈরি করতেও আমরা সবাই নির্দ্বিধায় বিভিন্ন কোম্পানির গুঁড়ো দুধ ব্যবহার করে থাকি। ক্ষতিকারক মেলামিন খেলে কিডনীতে পাথর জমা থেকে শুরু করে কিডনী অকেজো হয়ে যেতে পারে।

চীন থেকে আমদানি করা ইয়াশলি-১, ইয়াশলি-২, সুইট বেবি-২, অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি করা রেডকাউ, ডিপ্লোমা, ডানো এবং নিউজিল্যান্ড থেকে আমদানি করা নিডো, ফরটিফায়েড, অ্যানলিন-এ ক্ষতিকারক মেলামিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের পরীক্ষাগারে ধরা পড়ে। এর মধ্যে নিডোতে সবচেয়ে বেশি এবং ডানোতে তুলনামূলক ভাবে কম মেলামিন পাওয়া গেছে বলে ঐ রিপোর্টে প্রকাশ করেছে। সিগারেটের বিজ্ঞাপন যেভাবে বন্ধ হয়ে গেছে অনুরূপভাবে গুঁড়োদুধসহ সব ধরনের শিশুর খাদ্যের বিজ্ঞাপন বন্ধ করতে হবে। এ দাবি জনগণকে করতে হবে এবং মিডিয়াকে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

পৃথিবীর কোনো চিকিৎসক কখনো গুঁড়োদুধ শিশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহারের কথা বলে না। তবুও বিজ্ঞাপনের অত্যাচারে অনেকে এগুলো ব্যবহার করে। তাছাড়া শিশুর সাথে সাথে বড়রাও এটা খেয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে, শিশুর জন্য মায়ের দুধ মহান আল্লাহর দেওয়া এক আশ্চর্যজনক নিয়ামত। তাই এই রহমত থেকে আমাদের শিশুকে কোনো মতেই বঞ্চিত করা যাবে না। তবে প্রয়োজন দেখা দিলে শিশুকে গাভীর দুধ খাওয়ানো যেতে পারে। এজন্য গাভীর পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করতে হবে। তাই গরুর লালন পালনে মনোনিবেশ করতে হবে। গাভী পালনের মাধ্যমে আমাদের সীমিত সম্পদ দিয়ে আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

বিজ্ঞানীদের মতে, আগামী ২০ বছরে দেশে দুধ উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় ৬ গুণ বাড়ানো সম্ভব। যদিও শিশুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। এই লক্ষ্যে বিজ্ঞানীগণ বলেছেন, জাতীয় পশু সম্পদ নীতিমালায় দেশীয় গাভীকে সঙ্করায়ন এর মাধ্যমে দুধ উৎপাদন বাড়ানোর যে রূপরেখা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অতি তাড়াতাড়ি বাস্তবায়ন করা দরকার। দেশি গাভী প্রতিদিন গড়ে দেড় থেকে দু কেজি দুধ দেয়, অপরদিকে ''সঙ্কর''

জাতীয় গাভী গড়ে দশ কেজি দুধ দিয়ে থাকে। তাঁরা বলেন, দেশে প্রায় ৫০ লাখ দেশীয় দুধেল গাভী আছে। এগুলোকে ''সঙ্করায়ন'' করতে হবে ফ্রিজিয়ান কিংবা জার্সি জাতের ষাঁড়ের বীজ দিয়ে। তাহলে প্রতিদিন গড়ে ১০ কেজি করে দুধ সংগ্রহ করা যাবে ৫০ লাখ টন। আগামী ৫ বছরে যদি এই প্রকল্পের ১০ শতাংশও বাস্তবায়ন করা যায় তবে দৈনিক দুধ পাওয়া যাবে ৫ লাখ টন যা একই সংখ্যক দেশি গাভীর দুধের চেয়ে ৪ লাখ টন বেশি। সরকারকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে। বেসরকারীভাবেও উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে, আর বসে থাকার সময় নেই। অন্য দেশের দিকে চেয়ে থাকারও দরকার নেই। নিজেদেরকে নিজেদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে এবং এটা সম্ভব।

আমাদের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে এ ব্যাপারে যে পরিকল্পনার কথা বলেছেন তা হলো :

১। অতিদ্রুত ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন করা।

২। সঙ্করায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে দেশি গাভীগুলোকে উন্নত জাতে উন্নীত করা।

৩। জাতীয় পশু জার্ম প্লাজমা নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠন করা।

৪। জাতীয় পশু সম্পদ নীতিমালার কিছু পরিবর্তন আনা।

৫। গোখাদ্য উৎপাদনের কৌশল নির্ণয় করা।

৬। সরকারের ভর্তুকির ব্যবস্থা করা।

৭। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে দুধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা।

আসুন আমরা সম্মিলিতভাবে গুঁড়োদুধ বর্জন করি। কেননা এটা ছাড়া আমরা চলতে পারব না এমনটি নয়। অন্যরা বলবেন যে, আমরা তাহলে ক্যালসিয়াম পাব কিভাবে? আসলে দুধের বিকল্প বহু খাবার আছে যা খেলে প্রচুর ক্যালসিয়াম আমরা পেতে পারি। যেমন : গুঁড়ো মাছ, পোস্তদানা, জিরা, সরিষা, ডাল এগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম আছে বিধায় দুধ ছাড়াই ক্যালসিয়ামের চাহিদা দেহে পূরণ হবে। গুঁড়োদুধ ভারত ডেনমার্ক থেকে আসে। এগুলো সবই পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। সবচেয়ে উত্তম কাজ হলো গুঁড়োদুধ ও শিশুখাদ্য একেবারেই আমদানি না করা এবং বিজ্ঞাপন না দেওয়া।

বাংলাদেশ ব্রেস্ট ফিডিং ফাউন্ডেশন (বিবিএফ) কর্তৃক বুকলেট থেকে কতিপয় মূল্যবান অধ্যায় নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

শিশুর জন্মের ১ ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়া শুরু করার জন্য করণীয় : জন্মের পরপরই শিশুর কান্না শুরু এবং স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার পর-

(১) শিশুকে ধরার আগে হাত সাবান পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন।

(২) শিশুর হাত বাদে, শরীরের অন্যান্য ভেজা অংশ নরম সুতির কাপড় দিয়ে শুকিয়ে নিন।

(৩) শিশুকে মায়ের কাছে গালে গাল লাগিয়ে চুমু খেতে দিন।

(৪) ডান কানে আযান দিন।

(৫) ডেলিভারীর পরপরই শিশু সবচেয়ে বেশি সজাগ এবং তৎপর থাকে।

(৬) শিশুর ত্বক মায়ের ত্বকে লাগিয়ে রাখার জন্য শিশুকে উপুড় করে খালি গায়ে মায়ের বুকের মাঝখানে রাখুন। এ অবস্থায় মা ও শিশুকে একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিন।

(৭) মায়ের ত্বকের সাথে শিশুর ত্বক এভাবে লাগিয়ে রাখলে শিশুর তাপমাত্রা সঠিক থাকবে।

(৮) শিশু বুকের ওপর থেকে যেন পড়ে না যায় সেদিকে মা খেয়াল করবেন। মা হাত দিয়ে শিশুকে স্পর্শ করবেন বুলাবেন ও আলতোভাবে হাত বুলাবেন।

(৯) এই মুহূর্তে মায়ের স্পর্শ শিশুর ব্রেন উন্নত করে।

(১০) মায়ের ত্বকের সঙ্গে শিশুর ত্বকের সংস্পর্শে মায়ের শরীরের জীবাণু শিশুর শরীরে প্রবেশ করে রোগ সংক্রমণের প্রতিরোধকারী (antibody) তৈরি করবে।

(১১) এভাবে মা ও শিশুকে ত্বকে ত্বক লাগিয়ে রাখলে শিশুর জন্য তাপমাত্রা, ভালোবাসা, নিরাপত্তা ও খাদ্যের ব্যবস্থা হবে।

(১২) মায়ের মাথার নিচে বালিশ দিবেন যেন মাথাটা একটু উঁচুতে থাকে যাতে শিশু মায়ের চোখে চোখ রাখতে পারে।

(১৩) মায়ের পেটের ওপর শিশুর পায়ের সঞ্চালন মায়ের জরায়ুকে সংকুচিত করতে সাহায্য করবে এবং তাতে ফুল সহজে বের হয়ে আসবে এবং মায়ের রক্তপড়া কমে যাবে।

(১৪) মায়ের দুধ তৈরি আছে বুঝে শিশুর মুখে লালা আসে।

(১৫) এই সময় শিশু গন্ধ ভালোভাবে পায়। মায়ের জরায়ুর ভিতরের পানির গন্ধ মায়ের দুধের বোঁটার (nipple) নিঃসরণের (secretion) এই গন্ধ শিশুকে দুধের বোঁটার দিকে টেনে নিয়ে যায়।

(১৬) এই সময়ে শিশুর নড়াচড়ার জন্য তার ঘাড়, কোমর ও গলার মাংসপেশী যথেষ্ট সরল থাকে।

(১৭) শিশু মায়ের দুধের বোঁটা নাড়াচাড়া করলে মায়ের দুধ সহজে সে মুখে নিতে পারে। তাছাড়া এই নাড়াচাড়া মায়ের শরীরে অক্সিটোসিন তৈরি করে যেটা জরায়ুকে সঙ্কুচিত করে। এতে ফুল সহজে বের হয়ে আসে এবং মায়ের শরীরে রক্ত পড়া কমে ও বন্ধ হয়।

(১৮) শিশু শেষে বোঁটা পর্যন্ত পৌঁছে মুখ বড় করে হা করে এবং মায়ের দুধ মুখের ভিতরে নেয়।

(১৯) এই পর্যায়ে শিশু রীতিমত মায়ের দুধ টানা শুরু করে।

(২০) শিশু মায়ের দুধের বোঁটার পেছনের কালো অংশটা (areola) ভালভাবে দেখতে পায়। এমনকি যদি শিশু তার মাথা উঁচু করে তাহলে সে তার মায়ের চেহারাও দেখতে পারে।

(২১) শিশুর প্রথম মায়ের দুধ খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত মা ও শিশুকে ত্বকে ত্বক লাগিয়ে রাখুন- আলাদা করবেন না।

জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু, রক্ষা করে বিশ্বের ১০ লক্ষাধিক নবজাতক শিশুর জীবন:

প্রতি বছর বিশ্বে ৪ মিলিয়ন নবজাতকের মৃত্যু ঘটে জন্মের ৪ সপ্তাহের মধ্যে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ২২ শতাংশ শিশুর মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে যদি নবজাতকের জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু করা যায়। যদি বিশ্বের সব নবজাতকের জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু করা যায় তাহলে ৪ মিলিয়ন নবজাতক মৃত্যু সংখ্যার মধ্যে ১ মিলিয়নের জীবন রক্ষা পাবে।

গবেষণায় আরো দেখা গেছে, শিশুর প্রথম ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ পান করানোই সর্বোৎকৃষ্ট কার্যকরী প্রতিরোধ ব্যবস্থা যা ৫ বছর বয়সের নিচে শিশু মৃত্যুর হার শতকরা ১৩ ভাগ কমাতে পারে। শিশুর ৬ মাস বয়সের পর থেকে ২৪ মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধের পাশাপাশি সঠিকভাবে বাড়তি খাবার দিলে ৫ বছর বয়সের নিচে আরো শতকরা ৬ ভাগ শিশুর মৃত্যু হার কমানো সম্ভব।

জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রথম ঘণ্টা

জন্মের পরপরই যখন একজন সুস্থ নবজাতককে উষ্ণ রাখার জন্য মায়ের পেট এবং বুকে রাখা হয়, তখন তারা অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে এবং তারা সচেতন থাকে। শিশুরা এই সময় আস্তে আস্তে সামনের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হতে পারে। মায়ের নরম স্পর্শে তারা উদ্দীপিত হয়ে পেট অতিক্রম করে বুকের কাছে পৌঁছায় এবং মায়ের স্তন স্পর্শ করে। শিশুর নরম হাত বা মাথার স্পর্শে উদ্দীপিত হয়ে মায়ের শরীরে অক্সিটোসিন হরমোন নিঃসরিত হয়, যার ফলে বুকের দুধের প্রবাহ শুরু হয় এবং শিশুর প্রতি মায়ের ভালোবাসাও বৃদ্ধি পায়। এরপর শিশু মায়ের শরীরের গন্ধ নেয়, মুখ দিয়ে স্তনের বোঁটা ঘঁষে এবং অবশেষে মায়ের বুকে মুখ লাগিয়ে দুধ খাওয়া শুরু করে। পর্যায়ক্রমিক এই আচরণসমূহ শিশুর বেঁচে থাকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সঠিকভাবে মায়ের দুধ দান

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ ও পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার অনুমোদন করেছে যে, শিশুরা জীবনের প্রথম ৬ মাস শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাবে এবং ৬ মাসের পর থেকে ২ বছর বা তার বেশি সময় পর্যন্ত মায়ের দুধের পাশাপাশি সঠিক বাড়তি খাবার খাবে।

শিশুর ত্বকের সঙ্গে মায়ের ত্বকের সংস্পর্শ এবং জন্মের ১ ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো :

(১) মায়ের শরীর শিশুকে যথোপযুক্তভাবে উষ্ণ রাখতে সাহায্য করে, যা কিনা ছোট এবং কম ওজন (২.৫ কেজি) নিয়ে জন্ম নেওয়া শিশুর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

(২) এই অবস্থায় শিশুর অস্থিরতা থাকে না বরং তারা শান্ত থাকে; শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের হার স্বাভাবিক থাকে।

(৩) শিশু প্রথমে মায়ের শরীরের জীবাণুর সংস্পর্শে আসে যেগুলোর বেশির ভাগই ক্ষতিকারক নয় অথবা মায়ের দুধে এই সব জীবাণুর প্রতিরোধক উপাদান থাকে। মায়ের জীবাণু শিশুর অন্ত্র ও ত্বকে অবস্থান করে এবং পরিবেশের বেশি ক্ষতিকারক জীবাণুর সাথে প্রতিযোগিতা করে যার ফলে শিশুরা রোগ সংক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

(৪) শিশুর প্রথম খাবার হিসাবে শাল দুধ গ্রহণ একটি স্বর্ণমান এবং শাল দুধকে জীবনের প্রথম উপহার হিসাবে অভিহিত করা যায়।

✡ শালদুধ ইমিউনোলোজিক্যালি সক্রিয় কোষ, এন্টিবডি ও অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিনসমৃদ্ধ এবং এটি শিশুর প্রথম টিকা হিসাবে কাজ করে। শালদুধ বহু রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং এটি শিশুর নিজস্ব তৈরি প্রতিরোধ প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করতে সহায়তা করে।

✡ শালদুধে শরীর বৃদ্ধিকারক উপাদান থাকে যেটা নবজাতকে পরিপাচক অন্ত্রসমূহকে পরিপক্ক ও কার্যকরী করতে সহায়তা করে। এর ফলে শিশুর শরীর রোগ সংক্রমণ ও অ্যালার্জিতে আক্রান্ত হওয়া কঠিন হয়।

✡ এটি ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ যা শিশুর চোখ সুরক্ষিত রাখে এবং সংক্রমণ কমায়।

✡ এটি শিশুর পরিপাচক অন্ত্রসমূহকে উদ্দীপ্ত করে যাতে করে অন্ত্র থেকে দ্রুত মিকোনিয়াম পরিষ্কার হয়। এই ব্যবস্থা জন্ডিস সৃষ্টিকারী উপকরণকে শিশুর শরীর থেকে বের হয়ে যেতে সাহায্য করে।

✡ শালদুধ অল্প মাত্রায় আসে তবে এই পরিমাণই নবজাতকের জন্য যথেষ্ট।

✡ অক্সিটোসিন হরমোন জরায়ুর সংকোচন ঘটায় যা দ্রুত গর্ভ ফুল পড়তে সহায়তা করে এবং প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ হ্রাস করে।

✡ অক্সিটোসিন অন্যান্য হরমোনকে উদ্দীপ্ত করে যার ফলে মা শান্ত, অবসাদমুক্ত বোধ করেন এবং শিশুর সঙ্গে মায়ের ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ় হয়।

✡ অক্সিটোসিন মায়ের স্তন থেকে দুধের প্রবাহকে উদ্দীপ্ত করে।

(৬) মায়েরা তাদের সন্তানের সাথে এই প্রথম যোগাযোগে অতিশয় আনন্দবোধ করেন এবং বাবারাও পায়ই এই আনন্দ উপভোগ করেন। এভাবে মা ও শিশুর মধ্যে বন্ধনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

প্রত্যেক শিশুর জন্মের পর অতিসত্বর মা ও শিশুর পারস্পরিক ত্বকের সাথে সংস্পর্শ স্থাপন এবং মা যখনই বুকের দুধ দেওয়ার জন্য তৈরি, দ্রুত তা খাওয়ানো শুরু করা উচিত।

মায়ের বুকে শিশুর সংযোগ ও সংস্থাপনে মাকে সাহায্য করা জন্মের পর মা ও শিশুকে এক সাথে রাখা, শিশু যতবার চায় ততবার খাওয়াতে উৎসাহ প্রদান করা, কৃত্রিম চুষনী ব্যবহার থেকে বিরত রাখা এবং অন্য কোনো খাবার ও পানীয়/তরল প্রদান থেকে বিরত থাকা। শিশুবান্ধব হাসপাতালগুলোতে মায়ের দুধ দেয়া শুরু করা ও শুধুমাত্র দুধ খাওয়ানোর হার এবং মায়ের দুধ খাওয়ানোর সময়ের অনেক উন্নতি লাভ হয়েছে।

গবেষণা বুলেটিন

যদি শিশুদেরকে জন্মের ১ ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ দেয়া যায়, তাহলে ১ মিলিয়ন শিশুর জীবন রক্ষা পেতে পারে।

আফ্রিকা মহাদেশের দেশ ঘানার গ্রামাঞ্চলে যেখানে জন্মের অল্পক্ষণের মধ্যেই দুধ পানের প্রচলন নেই, সেখানে গবেষকরা দেখেছেন যে, যেসব শিশুদেরকে জন্মের ১ ঘণ্টার মধ্যে মায়ের দুধ দান শুরু করা হয়েছিল নবজাতক সময়ে তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি ছিল ঐসব শিশুদের তুলনায় যাদের ক্ষেত্রে এটা করা হয়নি। (Edmond etal. 2006)। এই গবেষণার অন্য ফলাফলগুলো হলো নিম্নরূপ :

✡ যেসব শিশুর জন্মের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেও মায়ের দুধ দেওয়া শুরু করা হয়নি, সেসব শিশুদের আড়াইগুণ (২০.৫ সময়ের বেশি) মৃত্যুর ঝুঁকি ছিল ঐসব শিশুদের তুলনায় যাদের জন্মের পরপরই দুধ দেয়া শুরু করা হয়েছিল।

✡ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত শিশুদের মধ্যে ৩০ শতাংশকে ১ মাস বয়সের মধ্যেই অন্য দুধ বা খাবার দেয়া হয়েছিল এবং এসব নবজাতকের মৃত্যুঝুঁকি চারগুণ বেশি ছিল শুধুমাত্র মায়ের দুধ গ্রহণকারীদের তুলনায়।

গবেষণার উপসংহার : গ্রামাঞ্চলে ১৬ শতাংশ নবজাতকের মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে যদি নবজাতকদের জন্মের প্রথম দিন থেকেই শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানো হয়। ২২ শতাংশ নবজাতকের মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে যদি নবজাতকদের জন্মের ১ ঘণ্টার মধ্যেই মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু করা হয়।❑❐

এমফিল ও পিএইচডি : গবেষণার প্রকৃতি ও পদ্ধতি

ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ*

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষা বলতে এমফিল ও পিএইচডি গবেষণা প্রচলিত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মূলত জ্ঞান উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়। একজন গবেষকের কাজ হলো বিশ্বস্বীকৃত পন্থায় বিদ্যমান জ্ঞানের ভেতরগত ত্রুটি নির্ণয় করে তা পরিশোধন ও উন্নয়ন করা এবং বিদ্যমান জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করা। এ জন্য গবেষককে হতে হয় অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী; ফলে গবেষকের প্রধান কাজ হচ্ছে প্রথমত প্রচুর পরিমাণে অধ্যয়ন করা। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও পরিবেশের আলোকে গবেষণার চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবেষণা ছাড়া টেকসই উন্নয়নের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। ফলে গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যদিও আমাদের দেশে গবেষণাকে স্বীকৃত পেশা হিসেবে স্বীকার করা হয় না। গবেষকরা দেশ ও জাতির অমূল্য সম্পদ, জাতির গৌরব। গবেষক পৃথিবীর সকল বিষয় নিয়ে চিন্তা করবেন না, তবে যে বিষয় নিয়ে চিন্তা করবেন তার আদ্যোপান্ত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ফলাফল বের করে আনবেন, আনার চেষ্টা করবেন। নতুন জ্ঞান সৃষ্টিই গবেষকের কাজ। তারা গবেষণালব্ধ ফলাফল দিয়ে দেশ ও জাতি গঠনে শক্তি ও সাহস সঞ্চয়ন করেন এবং রাষ্ট্রকে আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য উৎসাহ উদ্দীপনা জোগান। সুতরাং গবেষণাকর্মগুলো আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ করে দেশপ্রেম, সুনাগরিক ও শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান রাখে। ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর সঠিক অবয়বের বিচ্যুতিজনিত হুমকি থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে গবেষণা চমৎকারভাবে ভূমিকা পালন করে। মানুষের যাপিত জীবনে ব্যক্তিগত আক্বীদা, বিশ্বাস ও ধর্ম চর্চার গতি-প্রকৃতির বহুমাত্রিকতা বিশ্লেষণে আলকুরআন ও সহীহ সুন্নাহর পথে বিশুদ্ধ পন্থায় চলতে আলোকবর্তিকার মতো পথ দেখায়।

গবেষণামূলক উচ্চশিক্ষার স্তর বর্তমানে বাংলাদেশে গবেষণামূলক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চশিক্ষার স্তর হচ্ছে এমফিল ও পিএইচডি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেড় বছর মেয়াদি এমএএস ডিগ্রি চালু আছে। যা সম্পন্ন করলে এমফিল না করেই পিএইচডিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ আছে। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ২ বছর মেয়াদি (সর্বোচ্চ ৩ বছর) এমফিল ডিগ্রি এবং ৩ বছর মেয়াদি (সর্বোচ্চ ৫ বছর) মেয়াদি পিএইচডি কোর্স চালু আছে। এসব ডিগ্রি দেশ ও দেশের বাইরের বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও অর্জন করা যেতে পারে। ইতোমধ্যে দেশের একমাত্র আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে। কামিল পাশ করে নির্দিষ্ট স্কোর নিয়ে শিক্ষার্থীরা এই কোর্সগুলোতে ভর্তি হতে পারবে।

গবেষণার বিষয় প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যসহ মোটামুটি সব বিষয়ের ওপর গবেষণা হচ্ছে এবং গবেষকরা তাদের গবেষণার মাধ্যমে উত্তরোত্তর গবেষণার পরিধি সম্প্রসারিত করছেন। একজন গবেষক কোন বিষয়ের ওপর গবেষণা করবেন সেটা নির্ভর করে তার ব্যক্তিগত চাহিদা এবং অ্যাকাডেমিক বিষয়ের ওপর যে বিষয়ে তিনি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করছেন অথবা অন্য অনুষদ ও বিভাগ থেকেও করা যেতে পারে যদি সেটা তার বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তবে গবেষকের কোন বিষয়ের প্রতি ঝোঁক আছে, তিনি কী নিয়ে কাজ করতে চান, গবেষণার বিষয় নির্ধারণে সেই বিশেষ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা উচিৎ। এতে গবেষণা চলাকালীন হতাশায় ধৈর্য ধরে টিকে থাকা ও পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সহজ হয়। গবেষণার গুণগত মানও ভালো হয়।

গবেষণা প্রার্থীর করণীয় : গবেষণা প্রার্থীর প্রথম যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে সুপারভাইজার বা গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন, যার তত্ত্বাবধানে থেকে গবেষণা প্রার্থী তার গবেষণার কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন।

*সহকারী অধ্যাপক (বিসিএস সাধারণ শিক্ষা)
সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

সুপারভাইজার গবেষণা প্রার্থীর গবেষণার বিষয় ঠিক করে দিবেন, গবেষণার কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন। তাই প্রার্থীকে সুপারভাইজার নির্বাচন করতে হবে নিজ প্রচেষ্টার মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয় হচ্ছে তত্ত্বাবধায়কের গবেষণার ক্ষেত্র, গবেষণার ব্যাপারে তার ইচ্ছা, আগ্রহ সর্বোপরি তার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা। এ ক্ষেত্রে সমচিন্তার হলে ভাল হয়।

কোথায় গবেষণা করবেন : বাংলাদেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৫৮টির মতো। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা কোর্স চালু না হলেও পুরোনো প্রথম সারির ও সরকারি বিশ্বাবদ্যালয়গুলো মূলত এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানের জন্য উপযুক্ত। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গবেষণার কাজ হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত গবেষণা ইনস্টিটিউটসমূহে। ইনস্টিটিউট এবং বিভাগগুলোর মাধ্যমে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

গবেষণার সুফল : একজন গবেষক তার গবেষণাকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারলে তিনি নিজে যেমন উপকৃত হবেন, পাশাপাশি দেশ ও জাতি গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। গবেষণাকাজে তার পরিশ্রমপ্রিয়তা তাকে অন্যান্য গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করবে। এভাবেই তিনি হয়ে উঠবেন একজন প্রতিভাবান গবেষক। গবেষণার নির্ধারিত বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠবেন।

ভর্তির প্রাথমিক যোগ্যতা : দেশের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমফিল ও পিএইচডিতে ভর্তির যোগ্যতা প্রায় একই রকম। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে কিছুটা তারতম্য আছে। এর মধ্যে মূল ধারার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা তুলে ধরা হলো।

এমফিল প্রোগ্রাম

১. ভর্তির যোগ্যতা : ক) চার বছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান ডিগ্রি অথবা ফাযিল ডিগ্রি অথবা খ) তিন বছর মেয়াদি স্নাতক বা ফাযিল সম্মান ও এক বছর মেয়াদি মাস্টার্স বা কামিল ডিগ্রি অথবা প্রার্থীদের সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ/শ্রেণিসহ ন্যূনতম ৫০% নম্বর থাকতে হবে। ঈ.এ.চ.অ.নিয়ম থাকলে মাধ্যমিক/সমমান থেকে স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় ঈ.এ.চ.অ. ৫-এর মধ্যে ৩.৫ অথবা ঈ.এ.চ.অ. ৪-এর মধ্যে ৩ থাকতে হবে।

২. মেয়াদ : এমফিল. প্রোগ্রামের মেয়াদ দুই বছর। প্রথম বর্ষ কোর্স ওয়ার্কস ও ২য় বর্ষ থিসিস। তবে এমফিল প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৪ (চার) বছর।

৩. কোর্স ও ক্লাস : সকল অনুষদের/ইনস্টিটিউটের এমফিল কোর্স পূর্ণকালীন কোর্স হিসেবে গণ্য হবে। এমফিল প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত গবেষকদের জন্য সর্বোচ্চ ২০০ নম্বরের দুই ইউনিট (প্রতি ইউনিট ১০০ নম্বর) অথবা চার ইউনিট (প্রতি ইউনিট ৫০ নম্বর) তত্ত্বীয় কোর্স ১ম বর্ষে সম্পন্ন করা আবশ্যক। প্রতি কোর্সে ১০০ নম্বরের ইউনিটের জন্য ৪ ঘণ্টার এবং ৫০ নম্বরের ইউনিটের জন্য ২ ঘণ্টার পরীক্ষা দিতে হবে। এছাড়া ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষাও থাকবে। তত্ত্বীয় পরীক্ষায় পাস নম্বর গড়ে ৫০% এবং মৌখিক পরীক্ষায় পাস নম্বর ৫০%।

৪. ছুটি : চাকরিরত প্রার্থীদের ১ (এক) বছরের ছুটি নিয়ে এমফিল প্রোগ্রামে যোগদান করতে হবে। তবে কোনো আবেদনকারী যদি কোনো উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অথবা গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকেন, সে ক্ষেত্রে বিভাগের/ইনস্টিটিউটের অ্যাকাডেমিক কমিটির এবং সংশ্লিষ্ট অনুষদের সুপারিশের ভিত্তিতে অ্যাকাডেমিক পরিষদ তা শিথিল করতে পারে।

৫. দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি : এমফিল ১ম বর্ষ উত্তীর্ণ গবেষকগণকে পরীক্ষার ফল প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে ২য় বর্ষে ভর্তি হতে হবে।

৬. পুনঃভর্তি : কোনো এমফিল গবেষক ১ম বর্ষ পরীক্ষায় প্রথম বারে পাস করতে না পারলে অথবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে অথবা কোর্স সমাপ্ত করতে না পারলে তত্ত্বাবধায়ক ও বিভাগীয় অ্যাকাডেমিক

কমিটির সুপারিশে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে শুধু একবার পুনরায় ভর্তি হয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এরপর আর পুনঃভর্তির সুযোগ থাকবে না। সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক ও বিভাগীয় অ্যাকাডেমিক কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উপাচার্য মহোদয় পুনঃভর্তির অনুমতি দিবেন।

৭. থিসিস জমা ও সময়বৃদ্ধি : ক) এমফিল ১ম পর্বের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ১ (এক) বছরের মধ্যে থিসিস জমা দিতে হয়। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেউ থিসিস জমা দিতে না পারলে তাকে সময়বৃদ্ধির নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করে তা সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউটের অ্যাকাডেমিক কমিটি ও সংশ্লিষ্ট অনুষদ সভার সুপারিশের পর অনুমোদনের জন্য বোর্ড অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ ও অ্যাকাডেমিক পরিষদের সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

খ) কোনো গবেষকের থিসিস জমা দেয়ার সময় পার হয়ে গেলে তিনি তা জমা দানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক ও বিভাগের/ ইনস্টিটিউটের প্রধানের সুপারিশসসহ উপাচার্য মহোদয় বরাবর সাদা কাগজে আবেদন করলে উপাচার্য মহোদয় সিন্ডিকেটের ৬/১২/২০০১ তারিখের সিদ্ধান্ত বলে গবেষককে থিসিস জমা দেয়ার জন্য আরো ৬ (ছয়) মাস সময় বৃদ্ধির বিষয়ে বিবেচনা করতে পারেন।

গ) এমফিল প্রোগ্রামে যোগদানের পর গবেষক ৩ শিক্ষাবর্ষের মধ্যে থিসিস জমা দিতে না পারলে ২০০০ টাকা এবং ৫ শিক্ষাবর্ষের মধ্যে জমা দিতে না পারলে ৪০০০ টাকা বিলম্ব ফিস দিয়ে তা জমা দিতে পারবেন।

৮. বৃত্তি : এমফিল প্রোগ্রামে প্রতি শিক্ষাবর্ষে আবেদনকারীদের মধ্য থেকে মেধার ভিত্তিতে ইতিহাস বিভাগের জন্য নির্ধারিত একটি শেরেবাংলা বৃত্তিসহ মোট ৩৬টি বৃত্তি মাসিক ৩০০০ টাকা হারে মঞ্জুর করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস) এর গবেষকদের মাসিক ১৫০০০ টাকা করে দেওয়া হয়। তবে গবেষক চাকরিরত থাকলে অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে বৃত্তি/আর্থিক সহযোগিতা পেলে এ বৃত্তি ভোগ করার যোগ্য বিবেচিত হবেন না। ২য় বর্ষে এই বৃত্তি নবায়নের ব্যবস্থা থাকবে। তবে বৃত্তিধারী গবেষক যদি প্রথম বর্ষে প্রথমবারে পাস করতে না পারেন তবে এই বৃত্তি নবায়ন করা হবে না।

পিএইচডি প্রোগ্রাম

১. ভর্তির শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা

ক) এমফিল পাস অথবা খ) ৪ (চার) বছর মেয়াদি স্নাতক/ফাযিল/স্নাতক সম্মান ডিগ্রি এবং ১ (এক) বছর মেয়াদি মাস্টার্স/ কামিল ডিগ্রি। শিক্ষা জীবনে সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ/ শ্রেণি (ন্যূনতম ৫০% নম্বর) থাকতে হবে। ঈ.এ.চ.অ. নিয়ম থাকলে মাধ্যমিক/সমমান থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় ঈ.এ.চ.অ. ৫-এর মধ্যে ৩.৫ অথবা ঈ.এ.চ.অ.৪-এর মধ্যে ৩ থাকতে হবে। উল্লিখিত ন্যূনতম নম্বর বজায় রেখে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনস্টিটিউট/ পিএইচডি উপ-কমিটি/ অনুষদ নিজ নিজ ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করবে।

২. মেয়াদ

পিএইচডি প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ৪ (চার) বছর। ২ (দুই) বছর পর থিসিস জমা দেয়া যায়। থিসিস জমা না হওয়া পর্যন্ত প্রতি বছর একই সময় রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দিতে হবে। সময়মতো রেজিস্ট্রেশন ফি জমা না দিলে নিয়মানুযায়ী বিলম্ব ফি প্রদান করতে হবে। খণ্ডকালীন পিএইচডি প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর। ৪ (চার) বছর পরে থিসিস জমা দেয়া যাবে। তবে কোনো গবেষক যদি কাজ সম্পন্ন করে ৩ (তিন) বছরের শেষে থিসিস জমা দিতে চান তাহলে তত্ত্বাবধায়ক এবং বিভাগীয় অ্যাকাডেমিক কমিটির সুপারিশসহ অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের অনুমোদন নিয়ে বিশেষ বিবেচনায় জমা দিতে পারবেন।

৩. এমফিল থেকে পিএইচডি প্রোগ্রামে স্থানান্তর : যে সকল প্রার্থী এমফিল ১ম বর্ষের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছেন এবং ২য় বর্ষের মধ্যে আবেদন করছেন তাদেরকে গবেষণায় সন্তোষজনক অগ্রগতির ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়কের সুপারিশক্রমে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অ্যাকাডেমিক কমিটি, পিএইচডি উপ-কমিটি, অনুষদ সভার সুপারিশ এবং বোর্ড অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ ও অ্যাকাডেমিক পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে এমফিল থেকে পিএইচডি প্রোগ্রামে স্থানান্তর করা যাবে। *(বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে চিন্তা ও বিষণ্নতা

-ড. আব্দুল্লাহ আল খাত্বের
অনুবাদ: মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী*

(৮ম পর্ব)

*** দুশ্চিতা ও বিষণ্নতা হতে মুক্তির চতুর্থ উপায়-**

মানুষের মানসিক দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা হতে মুক্তির অন্যতম উপায় হচ্ছে অধিকতর খারাপ অবস্থা উপলব্ধি করা এবং আপনার চাইতেও যিনি অধিক সমস্যায় নিপতিত রয়েছেন সেটি বিবেচনা করা। এটিই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ অনুসরণ করেন। তবে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানোবিজ্ঞানী আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে এই পদ্ধতি দিয়েছেন। রাসূলের মক্কী জীবনে একদা নবীজি কা'বার ছায়ায় বিশ্রামরত অবস্থায় খাব্বাব বিন আরাত (রা) মক্কায় কাফের-মুশরিকদের পক্ষ থেকে যখন প্রচণ্ড নিপীড়ন ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তখন তিনি প্রিয় রাসূলের নিকট এসে বললেন: আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য দু'আ করবেন না? তখন প্রিয়নবী (সা) তাকে বললেন: তোমাদের পূর্বের লোকদের অবস্থা ছিল এই যে, তাদের জন্য মাটিতে গর্ত খোঁড়া হতো এবং ঐ গর্তে তাকে পুঁতে রাখা হতো। অতঃপর করাত দিয়ে তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করা হতো। এটা তাদেরকে দ্বীন হতে টলাতে পারেনি। লোহার চিরুনী দিয়ে শরীরের হাড়-মাংশ ও শিরা-উপশিরা সবকিছু ছিন্নভিন্ন করে দিত। আল্লাহর কসম, তিনি অবশ্যই এই দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করবেন। তখন একজন মানুষ সান'আ হতে হাযরামাউত পর্যন্ত সফর করবে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো।[২২]

এটিই মানসিক রোগের উত্তম একটি চিকিৎসা। সেহেতু আপনার নিকট কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি আসলে তখন তাকে বলবেন: আপনি যে সমস্যায় নিপতিত, সমাজে এমন অনেক লোক আছে, যাদের দুঃখ-দুর্দশা আপনার চাইতে আরো বেশি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, কেউ যদি কোন দুর্ঘটনায় তার সন্তানের মৃত্যুর কথা বলে, তখন তাকে বলতে হবে: সমাজে এমনও কিছু মানুষ আছে, যিনি এরূপ দুর্ঘটনায় তার পুরো পরিবারকে হারিয়েছেন অথবা কোনো সমস্যার কারণে তিনি তার স্ত্রী, সন্তান ও সকল সম্পদ হারিয়েছেন।

যদি কোনো ব্যক্তি কয়েকটি ব্যবসা কেন্দ্রের মালিক হন এবং কোনো কারণে তার একটি পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়, এরূপ ব্যক্তির অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাকে বলতে হবে, এমনও ঘটনা রয়েছে, একজন মানুষ তার সকল ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংস হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় সে তার নিজের বিপদ-মুসিবতকে ছোট মনে করবে। এরূপ ক্ষেত্রে আরেকটি সমাধান হলো: অধিকতর খারাপ অবস্থা উপলব্ধি করা। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমরা দুনিয়ার সম্পদের বিষয়ে তোমাদের চাইতে নিচু ব্যক্তিবর্গের দিকে তাকাও এবং যারা তোমাদের চেয়ে উচ্চ মর্যাদায় আসীন, তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করো না।[২৩]

এটা এ কারণে দুনিয়ায় কোনো বিপদ-আপদ ও মুসিবতে নিপতিত ব্যক্তি যদি তার চাইতে অত্যধিক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে, তবে সে তার নিজের বিপদকে ছোট মনে করে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া অদায়পূর্বক বলবে: আলহামদুলিল্লাহ, আমি অনেক ভাল আছি। এমনিভাবে অভাবী একজন মানুষ সে তার চাইতে আরো অধিক দরিদ্র ব্যক্তির অবস্থা উপলব্ধিপূর্বক আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে।

মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞগণ এটিকে সামষ্টিক চিকিৎসা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন এবং এই পদ্ধতির প্রয়োগ এভাবে করেন যে, একসাথে অভিন্ন রোগে আক্রান্ত কয়েকজনকে একত্রিত করে একস্থানে তাদেরকে বসিয়ে পরস্পরকে একে অপরের অবস্থা অবহিত হতে বলবেন। এসময় চিকিৎসক নিজেও তাদের সমস্যাগুলো শুনবেন এবং তুলনামূলকভাবে কার সমস্যাস কতটা গুরুতর তা চিহ্নিত করবেন। এক্ষেত্রে তারা পরস্পরের সমস্যাগুলো শুনে তুলনামুলক স্বল্প সমস্যায় জর্জরিত ব্যক্তি অধিকতর সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির মুসিবত শুনে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করবে। এক্ষেত্রে আমাদের একটি বিষয় মনে

* *শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও অনুবাদক, রাজকীয় সউদী দূতাবাস, ঢাকা।*

১ *সহীহ বুখারী, ইসলামে নবুওয়াতের নিদর্শনাবলী, হা: ৩৬১২*

২ *সহীহ বুখারী, রিকাক অধ্যায়, সহীহ মুসলিম, যুহদ (দুনিয়া বিমুখতা) অধ্যায়, হা : ২২৭২*

রাখতে হবে যে, মানুষের দৃষ্টিতে চিন্তা ও বিষণ্নতা তার বিপদ-আপদকে আরো বড় করে তোলে এবং বাস্তবতার চাইতে এটিকে সে আরও অধিক গুরুতর বলে মনে করে। এর উদারণ হিসেবে আমরা আল কুরআনের সূরা আলে ইমরানে উহুদের যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াতকে উপস্থাপন করতে পারি।

উহুদের যুদ্ধে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ রয়েছে। উহুদের যুদ্ধ ক্ষেত্রের প্রেক্ষাপট আমরা প্রত্যেকেই আমাদের কল্পনায় নিয়ে আসি এবং যুদ্ধের সূচনা থেকে শেষ অবধি এর চিত্র আমরা একটু চিন্তা করি। যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমানরা প্রায় বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। এমনকি মুসলিম বাহিনী কাফের-মুশরিকদের পলায়নের কারণে গনীমত সংগ্রহ শুরু করে দিয়েছিল। গনীমত সংগ্রহে ব্যস্ত হওয়ার দরুণ কতিপয় তীরন্দাজ তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে বাহিনীর কমান্ডার রাসূলের নির্দেশকে উপেক্ষা করেছিল। গনীমতের আকাঙ্ক্ষায় তারা নির্দিষ্ট স্থান ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। মুসলিম বাহিনীর গনীমত সংগ্রহে ব্যস্ততার পরিপ্রেক্ষিতে কাফের বাহিনী তাদের সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে (তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি) পেছন হতে আবার তাদের ওপর আকস্মিক হামলা করে। এতে যুদ্ধক্ষেত্রের চিত্র পরিবর্তন হয়ে যায় এবং যুদ্ধের ফলাফল মুসলিম বাহিনীর প্রতিকূলে চলে যায়। ফলে তারা চরম কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। এহেন বিপর্যয়কর অবস্থার মূল কারণ ছিল কতিপয় মুজাহিদের গনীমতের প্রতি লোভ ও আকাঙ্ক্ষা।

মুশরিক বাহিনীর হামলায় যুদ্ধ পরিস্থিতির এমন অবনতি হয় যে, রাসূলের নিহত হওয়ার খবর মুসলিমদের মাঝে গুজব হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে। এতে তারা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। মুশরিকদের আকস্মিক হামলায় খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন বিপণ্ন হওয়ার উপক্রম হয়। প্রিয় নবীজির সুরক্ষার জন্য কয়েকজন সাহাবী ঢালস্বরূপ রাসূলকে পাহারা দেন। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে রাসূল মুসলিমদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচল থাকার জন্য আহ্বান করতে থাকেন এবং কাফেরদের হামলায় পলায়ন না করার জন্য নির্দেশনা দেন।

এবার আমরা সূরা আলে ইমরানের একটি আয়াত অনুধাবনের চেষ্টা করবো। উক্ত আয়াতে আল্লাহ জাল্লা জালালুহ তাঁর ক্ষমতা ও বড়ত্ব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

অর্থ "স্মরণ কর, তোমরা যখন উপরের (পাহাড়ের) দিকে ছুটছিলে এবং পেছন ফিরে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না, আর রাসূল তোমাদেরকে পেছন দিক থেকে ডাকছিলেন। ফলে তিনি তোমাদেরকে বিপদের ওপর বিপদ দিলেন, যাতে তোমরা যা হারিয়েছ এবং যে বিপদ তোমাদের ওপর এসেছে তার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত।"[২৪]

উপরোক্ত আয়াতের দিকে লক্ষ্য করুন, আল্লাহর বাণী: "ফলে তিনি তোমাদেরকে বিপদের ওপর বিপদ দিলেন,"। তাহলে চিন্তা বা বিপদ কি পুণ্যের অন্তর্ভুক্ত? এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে চিন্তার মাধ্যমে স্থিতিশীল করলেন, যাতে তারা দুঃখিত না হয়?

মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন: প্রথম বিপদ হচ্ছে পরাজয় এবং গনীমতের লোকসান।

দ্বিতীয় বিপদ হচ্ছে: প্রিয় নবীজির নিহতের গুজব ছড়িয়ে পড়া। এই গুজবের কারণে মুসলমানরা পরাজয়ের চাইতেও বড় বিপদের সম্মুখীন হলো। কেননা, প্রিয় নবীর নিহতের খবর তাদের নিকট যুদ্ধে পরাজয়বরণ, গনীমত হতে বঞ্চিত হওয়া, কতিপয় সাহাবীর শাহাদাতবরণ এবং আহত হওয়ার চাইতেও ছিল অনেক বড় দুঃসংবাদ। পরিশেষে যখন সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের বেঁচে থাকা ও সুস্থ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হলেন, এতে তারা চরম আনন্দিত হলেন এবং পুর্বোক্ত পরাজয়, গনীমত হারানো, শাহাদত ও অনেক সাহাবীর হতাহতের বিশাল ক্ষতি সত্ত্বেও তারা আনন্দিত হলেন। একারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

অর্থাৎ, "তিনি তোমাদেরকে বিপদের ওপর বিপদ দিলেন, যাতে তোমরা যা হারিয়েছ এবং যে বিপদ তোমাদের ওপর এসেছে তার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও।" এ কারণেই মানুষকে বিপদ-আপদে সবর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে সমস্যা অনেকাংশে লাঘব হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সর্বদা সবরের অধিকারী হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।❑❑

৪ সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৫৩

মুক্তমনা বনাম সুস্থ ভাবনা

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব *

(পর্ব-১)

বর্তমান সময়ে মুক্তমনা শব্দটি বেশ আলোচিত ও সমালোচিত। বিশেষ করে যারা ধর্মীয় রীতিনীতিতে বিশ্বাস করেন এবং ধর্ম পালনে যারা অভ্যস্ত তাদের কাছে এ শব্দটি বেশ সমালোচিত। অন্যদিকে যারা ধর্মীয় রীতিনীতি বিশ্বাসী নয় বরং ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ও তা পালন করা শৃঙ্খলিত বা আবদ্ধ জীবন কিংবা বন্দি জীবন মনে করে থাকেন, তাদের কাছে মুক্তমনা শব্দটি বেশ সমাদৃত। মূলত যারা এ শব্দটিকে নেতিবাচক হিসাবে দেখেন তারা যেমন এটার গভীরতা ও মর্মকথা সম্পর্কে অবগত নয়, তেমনই যাদের কাছে এ শব্দটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও এর সাথে নিজকে জড়িয়ে অতি উৎসাহের সাথে আত্মতৃপ্তিতে ভোগেন তারাও এ মুক্তমনা শব্দটির গভীরতা ও মর্মকথা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত নন। এর ফলে মুক্তমনা শব্দ নিয়ে এক ধরনের ধূম্রজালের সৃষ্টি হয়েছে বলেই মনে হয়।

তবে বাংলা ভাষায় ২০০১ সালে মুক্তমনা নামে একটি ইয়াহু গ্রুপ কার্যক্রম শুরু করে। এরপর মুক্তমনা একটি ব্লগ ২০০২ সালে কার্যক্রম শুরু করে, যার প্রতিষ্ঠাতা হলেন সুপরিচিত ও বিশিষ্ট নাস্তিক অভিজ্যিত রায়। অনলাইনভিত্তিক এ ব্লগটি নাস্তিক্যবাদ তথা নিরিশ্বরবাদ প্রচার করা ও কঠোর ইসলামবিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। বিশেষ করে ইসলামের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে যাদের সাইনোসাইটিস রয়েছে তাদের কাছে এটা ব্যাপক সমাদৃত হয় এবং এ থেকে তারা কিছুটা হলেও অধ্যয়নের খোরাক সংগ্রহের চেষ্টা করে থাকেন।

এর ফলে মুক্তমনা শব্দটির সাথে নাস্তিক্যবাদ, ভাবভাদ ও ইসলামবিদ্ধেষী মনোভাবের অত্যন্ত শক্ত সম্পৃক্ততা রয়েছে। কেননা মুক্তমনা শব্দটি ইসলামবিদ্বেষীদের থেকেই জন্মলাভ করেছে এবং এটা ইসলাম বিদ্বেষীদের কাছেই ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। সুতরাং বাস্তবতা মুক্তমনা শব্দকে এমন জায়গায় দাঁড় করিয়েছে যে, মুক্তমনা বা মুক্তচিন্তা ও ইসলাম বিদ্বেষমনা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ বললে একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না।

✡ মুক্তমনা কী ?

মুক্তমনা শব্দটি মূলত মুক্তচিন্তার অনুসারীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত আধুনিক বাংলা অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুক্ত চিন্তা বলতে সংকীর্ণতা বর্জিত অসাম্প্রদায়িক মনোভাব।[২৫]

মুক্তচিন্তা, যাকে ইংরেজিতে Freethought বলা হয়। এটা এক ধরনের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, যার মূল বক্তব্য হলো বিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যা এবং যুক্তির আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। নিজ মতামত গঠনের ক্ষেত্রে প্রথা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও কোনো কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিৎ নয়। আর সচেতনভাবে মুক্ত চিন্তার প্রয়োগকে বলে মুক্তচিন্তা এবং এ আদর্শের অনুসারীদেরকে বলা হয় মুক্তমনা। ১৬০০ সালকে আধুনিক মুক্ত চিন্তার যুগের সূচনালগ্ন হিসাবে ধরা হয়ে থাকে।

সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে ইংল্যাণ্ডে বাইবেলের আক্ষরিক অর্থের বিরোধিতাকারীদেরকে মুক্তমনা বলা হলেও কাল পরিক্রমায় তা কট্টর ইসলাম বিদ্বেষীতে রূপলাভ করেছে। ১৯৪৪ সালে বার্ট্রান্ড রাসেল The value of free thought শিরোনামে একটা প্রবন্ধ লিখেন যার বাংলা অর্থ মুক্তচিন্তার মূল্য, সেখানে তিনি লিখেন : একজন মানুষের বিশ্বাসের দরুণ কেউ মুক্তমনা হয় না, সে মুক্তমনা হয়ে ওঠে কিভাবে বিশ্বাসকে যে ধারণ করে?

সুতরাং মুক্তমনা ও ধর্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি বিষয়, এতে বিন্দুমাত্র কোনো সংশয় থাকার কথা নয়।

আর এ মুক্তচিন্তার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিলো কমিউনিজম বা সেকুলারিজম। সবচেয়ে প্রাচীন, মুক্ত চিন্তাধারীদের সংগঠন হলো টরন্টে ক্রিথোট এসোসিয়েশন, যা ১৮৭৩ সালে অল্প সংখ্যক ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের হাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সুতরাং সেকুলারিজম শব্দটি অর্থগত ধর্মনিরেপক্ষতাবাদ হলেও আদর্শগতভাবে তা ধর্মহীনতা এবং বিশেষভাবে তা ইসলাম বিদ্বেষীদের উন্মুক্ত প্লাটফর্ম।

---

* *মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।*

[২৫] *আ. বা. অ : ১১১৮ পৃ.*

আর এ আদর্শের মধ্য হতেই কমিউনিজমের উৎপত্তি।

✡ মুক্তমনা ও কমিউনিজম :

আমরা মুক্তমনা শব্দটির সংগে কিছুটা হলেও পরিচিত হয়েছি এখন আমরা কমিউনিজমের সাথে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করছি। কমিউনিজম হলো কট্টর সাম্যবাদে বিশ্বাসী।

সাম্য হলো সমতা, একতা ও সমদর্শিতা। আর সাম্যবাদ হলো, যে মতবাদ জাতিধর্ম নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করে।[২৬]

এটা মূলত মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থা বিরোধী একটি বিপ্লব বললেও অতিরিক্ত হবে না।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজের মাঝে একপ্রকার জায়গীর প্রথার প্রচলন ছিলো। সে সমাজে সমস্ত ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলো স্বয়ং রাজা-বাদশাগণ। রাজা তার অধীনস্ত সকল জমিদারকে উক্ত জমি বণ্টন করে দিত। জমিদারেরা সে জমি আবার নিম্নভূস্বামীদিগকে বণ্টন করে দিত। নিম্নভূস্বামীরা আবার সেই জমি কৃষকদের মাঝে বিতরণ করতো। আর কৃষকরা ছিলো শুধু চাষাবাদ করার মালিক, ভক্ষণ করার মালিক তারা ছিলো না। হাড়ভাঙা খাটুনি করে তারা ফসল ফলাতো। উক্ত ফসলের অতি সামান্যই তারা পেতো, আবার কখনও বা কিছুই পেতো না। অর্থাৎ হাড় ভাঙা খাটুনি ও কষ্টের বিনিময়ে কৃষকরা ফসল উৎপাদন করতো আর উক্ত ফসল ভোগ করতো ভূস্বামী, জমিদার ও রাজাগণ।

কালক্রমে এ জায়গীর প্রথার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়ে ওঠে। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে প্রজাবিদ্রোহ দেখা দেয়।[২৭]

এ আন্দোলনই পরবর্তীতে সাম্যবাদের আন্দোলনে চিত্রিত হয় এবং তা দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সুতরাং কমিউনিজম পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি মতবাদ।

সাম্যবাদ কমিউনিজমের বাহ্যিক আন্দোলন হলেও তাদের দর্শন নিরিশ্বরবাদকেই উৎসাহিত করে।

কমিউনিজম দর্শনের পরস্পরবিরোধী দুটি ধারা রয়েছে।

১. আধ্যাবাদী বা ভাববাদী :

ভাববাদীদের বক্তব্য হলো, এ বিশ্বে তথা বস্তু জগতের প্রকৃত কোনো সত্তা নেই। আমরা আমাদের চোখের সামনে যা কিছু ঘটতে দেখি তা পূর্বেই আমাদের মনোজগতে ঘটে।

২. জড়বাদী বা বস্তুবাদী :

জড়বাদীদের বক্তব্য হলো, ভাব বলতে স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব নেই। বস্তুই আসল সত্য, ভাব নয়। তাদের দৃষ্টিতে পুরো বিশ্বজগত একটি মেশিন এমনকি তাদের দৃষ্টিতে মানুষও মেশিন ছাড়া অন্য কিছু নয়। জড়বাদীদের নিকট এ মহা বিশ্বের স্রষ্টা বলতে কোনো অস্তিত্ব নেই।[২৮]

সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, কমিউনিজমের ভাববাদ ও জড়বাদের দর্শনটা মুক্তমনা ও মুক্তচিন্তার দর্শন এবং স্রষ্টা সম্পর্কে তাদের দর্শন এক ও অভিন্ন। ভাববাদ, জড়বাদ এ দুটোই মুক্তমনা বা মুক্তচিন্তাবাদেরই উৎপাদিত ফসল। কাজেই মুক্তমনাবাদের অর্থ হলো স্রষ্টাবিহীন সৃষ্টির কাল্পনিক অবাস্তব চিন্তা।

✡ মুক্তমনাদের মন মুক্ত নয় শৃঙ্খলিত :

মুক্তমন অর্থ প্রভাবহীন মন, যে মনের ওপর কোনো প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ থাকে না তাকে মুক্তমন এবং কোনো ধরনের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রহীন চিন্তাকে মুক্তচিন্তা বলা হয়।

প্রশ্ন হলো মানুষের মন কি শতভাগ মুক্ত হতে পারে যে মনের ওপর কারো কোনো নিয়ন্ত্রন নেই? কারো চিন্তা কি শতভাগ নিয়ন্ত্রণমুক্ত হতে পারে? কিংবা বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো মানুষ কি কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত বাঁচতে পারে। ধরুন সময় একটি চরম বাস্তব ও আবশ্যকীয় বিষয়। পৃথিবীর সূচনা থেকেই সময় নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলেছে, চলছে এবং হয়তোবা চলবেও। কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ সময়ের চরম কোনো পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। আশা এবং বিশ্বাস কেয়ামত পর্যন্তও তা সম্ভব হবে না।

প্রবহমান বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সময়কে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন : অতীতকাল, বর্তমানকাল ও ভবিষ্যতকাল। এ তিনটি কালের দ্বারা জগতের সবকিছুই

[২৬] *আধুনিক বাংলা অভিধান- ১৩২২ পৃ.*
[২৭] *ইসলাম ও কমিউনিজম, গোলাম মোস্তফা- ১৫ পৃ.*
[২৮] *ইসলাম ও কমিউনিজম- ৪৪-৪৫ পৃ., মার্কসীয় দর্শন-১১২ পৃ.*

নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলিত বিধায় এ জগতের সবকিছুরই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতা প্রবহমান। যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৯৭১ সালে সংঘটিত হয়েছিলো। আজ যার বয়স ৫২ বছর। দিন যত অতিবাহিত হবে ততই স্বাধীনতার বয়স বাড়তে থাকবে। হাজারো চিন্তা গবেষণা করে ১৯৭১ সালকে কি বর্তমান সময়ে দাঁড় করানো সম্ভব? অবশ্যই না। তার অর্থ দাঁড়ায় দেশ স্বাধীনতার চিন্তা মনে উকি দিলেই তখনই মন ৫২ বছর পেছনে ফিরে যায়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে মন ১৯৭১ সালের দ্বারা শৃঙ্খলিত।

আবার এ জগতের সমস্ত মানুষের কথা বিশেষভাবে মুক্তমনাদের কথাই যদি বলা যায় তাহলে বলবো : প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের সাথে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত তথা সময়ের তিনটি ধারা আবশ্যকীয় ভাবেই অত্যন্ত শক্তভাবে যুক্ত রয়েছে। আজকের শিশু ভবিষ্যতের যুবক, আজকের যুবক ভবিষ্যতের বৃদ্ধ। সুতরাং কালভেদে মানুষের দেহ ও মনের পরিবর্তন অপরিহার্য। কোনো যুবক চাইলেই শিশুমনে ফেরত যেতে পারে না, কোনো বৃদ্ধ চাইলে যৌবনে ফেরত যেতে পারে না এমনকি কোনো শিশু কখন যুবক ও বৃদ্ধকালে অগ্রিম যেতে পারে না। সুতরাং জগতের সবকিছু সময়ের দ্বারা মজবুতভাবে শৃঙ্খলিত।

আর সময় সরাসরি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলিত।

আল্লাহ বলেন :

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى﴾

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ তা'আলা দিন রাত্রিতে ও রাত্রিকে দিনে প্রবেশ করান এবং চন্দ্র ও সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করছে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী।[২৯]

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন : নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

আল্লাহ তা'আলা বলেন : আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, সে সময়কে গালি দেয় অথচ আমি সময়, আমার হাতেই সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ ; রাত-দিনও আমি পরিবর্তন করি।[৩০]

উল্লেখিত আয়াতে কারীমা হতে আল্লাহ তা'আলা সময় সম্পর্কে বিস্ময়কর তথ্য প্রদান করেছেন। আল্লাহ রাত্রকে দিনে এবং দিনকে রাত্রের মধ্যে প্রবেশ করান অর্থাৎ, রাত দিনের পরিবর্তন তিনি করেন। চন্দ্র ও সূর্যকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং জগতের সবকিছুই নির্ধারিত সময় অনুযায়ী চলমান।

আর আলোচ্য হাদীসে আল্লাহ তা'আলা নিজকে রাত দিনের পরিবর্তন কারী ও সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রক বলে দাবি করেছেন। কোনো মুক্তমনা যদি বলে যে, আমি মুক্তমনায় বিশ্বাসী জগতের সবকিছু মুক্তভাবেই হয়েছে এতে কোনো স্রষ্টার প্রভাব কিংবা অস্তিত্ব নেই। তাহলে তাকে বিনয়ের সাথে একটি জিজ্ঞাসা করাই যায়, তাহলো : আল্লাহ তা'আলা রাত দিনের পরিবর্তন করেন বিধায় দিন শেষ হওয়ার পর রাত আগমন করে এটা যেমন বাস্তবতা ও চিরসত্য ঠিক তেমনি রাত আগমনের সাথে সাথে দিনের ১২/১৩ ঘণ্টা জগতের সবকিছু থেকে চির দিনের জন্য হারিয়ে গেল, এটাও চরম সত্য ও বাস্তবতা। মুক্তমনার মন যদি মুক্ত হয় তাহলে নিজের জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া ১২/১৩ ঘণ্টা উদ্ধার করে প্রমাণ করুন যেন আপনার মন মুক্ত যা ইচ্ছা তাই করতে পারে কোনো নিয়ন্ত্রণ মানে না। তখন তার উত্তর একটাই আসতে পারে তা হলো এটা সম্ভব নয়, কিংবা এটা কি সম্ভব? এর অর্থ হলো সেকেন্ড, মিনিট, দিন-রাত, মাস, বছর ও যুগের আবর্তন প্রবহমান সময়ের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করা। আত্মসমর্পণকারী মন কি মুক্ত হতে পারে?

সুতরাং জগতের সবকিছুই সময় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলিত আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক। জগতের কোনো কিছুই অনিয়ন্ত্রিত কিংবা শতভাগ মুক্ত নয়।

[২৯] *সূরা লুকমান, আয়াত : ২৯*

[৩০] *সহীহ বুখারী, হা : ৪৮২৭*

তেমনই মানব মনও আদর্শ থেকে মুক্ত নয়। নাবী ﷺ বলেছেন :

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، .... فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ.

প্রত্যেক নবজাতকই (স্বভাবগত আদর্শ তথা ইসলাম) এর ওপর জন্মলাভ করে। অতঃপর তার পিতা মাতা তাকে ইহুদী, নাসারা ও অগ্নিপূজারীরূপে গড়ে তুলে।[৩১] অতঃপর আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তেলাওয়াত করলেন :

﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾

আল্লাহর দেয়া ফিতরাত বা স্বভাবজাত ধর্মের অনুসরণ কর, যে ফিতরাত বা আদর্শের ওপর তিনি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন কর না। এটাই সরল ও প্রতিষ্ঠিত দীন।[৩২] এখানে ফিতরাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইসলাম।[৩৩]

সুতরাং প্রতিটা নবজাতক শিশু আল্লাহর দেয়া ফিতরাত বা আদর্শের ওপরই জন্মলাভ করে। মা-বাবা কিংবা অন্য কোনো আদর্শের প্রভাবে সে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়। আল্লাহ তা'আলা সকলকেই ফিতরাত বা ইসলামের ওপর সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মা-বাবা কিংবা পারিপার্শিক প্রভাবে সে ইহুদী নাসারা কিংবা অগ্নিপূজক হিসাবে গড়ে ওঠে। অনুরূপভাবে যে ভাব বাদীদের প্রভাবে ভাববাদী, জড়বাদীদের প্রভাবে জড়বাদী হিসাবে গড়ে উঠে অতঃপর সে মুক্তমনা হিসাবে গড়ে উঠে। সুতরাং মুক্তমনাদের মন কোনোক্রমেই মুক্ত নয় বরং ভাববাদী বস্তুবাদী নাস্তিক্যবাদ দ্বারা প্রভাবিত ও শৃঙ্খলিত। এর ওপর ইসলামবিদ্বেষীদের অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শর্তহীন সহযোগিতা মুক্তমনাদের নাস্তিক্যবাদ ও ইসলামবিদ্বেষ ছড়ানোর কাজকে আরো গতিশীল করার খোরাক জুগিয়েছে। ***চলবে ইনশাআল্লাহ।***

[৩১] *সহীহ বুখারী, হা : ১৩৫৯*
[৩২] *সূরা আর-রূম, আয়াত : ৩০, সহীহ বুখারী, হা : ১৩৫৯*
[৩৩] *ফাতহুল বারী- ৩/২৮ পৃ.*

এমফিল ও পিএইচডি : গবেষণার প্রকৃতি ও পদ্ধতি

(২০ পৃষ্ঠার পর থেকে)

৪. সময়বৃদ্ধি (উপাচার্য্যের ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে) : গবেষকদের থিসিস জমা দেয়ার সময় রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে এবং থিসিস জমা দেয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকলে সেক্ষেত্রে মাননীয় উপাচার্য অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন।

৫. পুনঃরেজিস্ট্রেশন : রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ (চার বছর) শেষ হলে আরো চার বছরের জন্য পুনরায় রেজিস্ট্রেশন করা যাবে।

৬. নতুনভাবে রেজিস্ট্রেশন : রেজিস্ট্রেশন এবং পুনরায় রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ (৪+৪=৮) আট বছর অতিক্রান্ত হলে নতুনভাবে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা থাকবে।

৭. সেমিনার বক্তব্য : সকল অনুষদের বিভাগ এবং ইনস্টিটিউটসমূহের পিএইচডি গবেষকদের প্রতি বছর স্ব স্ব অ্যাকাডেমিক কমিটির সম্মুখে একটি করে সেমিনার বক্তব্য দিতে হবে। এভাবে কমপক্ষে ২টি সেমিনার রিপোর্ট তত্ত্বাবধায়ক এবং বিভাগীয় অ্যাকাডেমিক কমিটির সুপারিশসহ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট থিসিসের সঙ্গে জমা দিতে হবে। সেমিনার বক্তব্যের রিপোর্ট ছাড়া থিসিস জমা নেয়া হবে না।

৮. বৃত্তি : প্রতি শিক্ষাবর্ষে আবেদনকারীদের মধ্য থেকে মেধার ভিত্তিতে মোট ৫টি বৃত্তি মাসিক ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা হারে মঞ্জুর করা হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস) এ পিএইচডি গবেষকদের মাসিক ২০০০০ টাকা করে দেওয়া হয়ে। এর মাঝে কেউ ইউজিসির স্কলারশিপ পেলে তিনি মাসিক ৩০০০০ টাকা করে পেয়ে থাকেন। এ ছাড়াও বঙ্গবন্ধু স্কলারশিপ এবং প্রধানমন্ত্রী স্কলারশিপ পিএইচডি গবেষকদের পাঁচ বছরব্যাপী মাসিক ২৫০০০ টাকা করে প্রদান করা হয়। তবে গবেষক চাকরিরত থাকলে অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে বৃত্তি/আর্থিক সহযোগিতা পেলে, এ বৃত্তি ভোগ করার যোগ্য বিবেচিত হবে না। ২য় বর্ষে এই বৃত্তি নবায়নের ব্যবস্থা থাকবে। ❐❑

সৃষ্টির আদী-অন্ত ঃ (শুরু থেকে লয়)

মুহাম্মাদ রফিকুর রহমান ★

আল্লাহ যখন পৃথিবী সৃষ্টি করলেন এবং মনুষ্য সমাগম শুরু হলো তখন কেমন অবস্থা বিরাজ করছিল পৃথিবী পৃষ্ঠে! ভাবনার পরিধি বিস্তৃত করে, কল্পনার ডানা প্রসারিত করে দেখুন-- অনুমান করা যায় যে, জনমানবহীন সু-বিস্তীর্ণ বিরান প্রান্তর, অতল, অথৈ, প্রান্তহীন মহাসাগর। গহীন অরণ্য, সু-উচ্চ পাহাড়-পর্বত, জ্বলন্ত লাভা উদ্গীরণকারী আগ্নেয়গিরি, কঙ্কর-নুড়ি বেষ্টিত উপত্যকা। কোথাও কোনো প্রাণের অস্তিত্ব নেই! কি একটা ভয়সঙ্কুল থমথমে পরিবেশ। পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে স্থিতিশীল করেছেন এবং আসমানকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে করেছেন সুন্দর।'[৩৪]

মহান স্রষ্টা তাঁর কুরআনে সূরা হা-মিম সেজদার ১০ নং আয়াতে বলছেন- 'তিনি তাতে (পৃথিবীতে) অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং স্থাপন করেছেন কল্যাণ এবং চার দিনের মধ্যে তাতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, সমানভাবে সকল অনুসন্ধানীদের জন্য। এ সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করার পরও কিন্তু পৃথিবীতে ভোগ করার কোনো মানুষ নেই। আশ্চর্য নয় কি? আল্লাহর সুদূরপ্রসারি নিখুঁত পরিকল্পনা আজকের বিজ্ঞজনেরাও চিন্তার কুল কিনারা খুঁজে পাবে না। আস্তে আস্তে পরিকল্পনা মাফিক মহান রব পৃথিবীকে মনুষ্য বসবাসযোগ্য করে তুললেন এবং জান্নাত থেকে আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম-কে ইবলিশসহ নামিয়ে পৃথিবীতে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। মাত্র দুজন মানুষ বেহেশতী পরিবেশ থেকে পৃথিবীতে এসে আল্লাহর শেখানো নির্দেশ মোতাবেক জীবন যাপন করতে শুরু করেন। আজ সেই অস্তিত্বহীন পৃথিবীতে {আদম-হাওয়া আলাইহিমাস সালাম} মাত্র দু'জন মানুষের বংশ পরিক্রমা পরম্পরায় বেশুমার মানুষের আনাগোনায় বর্তমানে শুধু জীবন্ত মানুষের পরিসংখ্যান হলো ৭০০ কোটির উপরে। সূরা হা-মিম সেজদাহ-এর ১০ নং আয়াতের তাফসিরে বলা বলা হচ্ছে- পাহাড়গুলোকে পৃথিবী থেকেই সৃষ্টি করে তার ওপর গেড়ে দেন যাতে পৃথিবী নড়া-চড়া না করে। অর্থাৎ, তাতে বরকত স্থাপন করেছেন। এ থেকে ইঙ্গিত করা হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি, বহু প্রকারের খাদ্যসামগ্রী, খনিজ পদার্থ এবং এ ধরনের আরো অনেক প্রকারের আসবাব-পত্রের প্রতি, যা পৃথিবীর বরকত বা কল্যাণ। আর প্রভূত কল্যাণের নামই হল বরকত। পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত সৃষ্টির খোরাক তাতে নির্ধারিত বা তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন-- যাতে প্রত্যেক অঞ্চলের সেখানকার স্থানীয় লোকদের ব্যবসা বাণিজ্যের বুনিয়াদ হয়ে যায়। (এবং অন্য অঞ্চলের সাথে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে সকলে লাভবান হয়) সৃষ্টির দু'দিন এবং বিস্তৃতকরণের দু'দিন। সব দিন মিলিয়ে হলো মোট চার দিন। যাতে এই সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন হয়। অর্থাৎ জিজ্ঞাসাকারীদের বলে দাও যে, সৃষ্টি ও বিস্তৃতকরণের এ কাজ ঠিক বা পূর্ণ চার দিনে সম্পন্ন হয়।

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন : 'তারা কি তাদের উপরে আসমানের দিকে তাকায় না, কিভাবে আমি তা বানিয়েছি এবং তা সুশোভিত করেছি? আর তাতে কোনো ফাটল নেই। আর আমি জমিনকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক প্রকারের সুদৃশ্য উদ্ভিদ উদ্গত করেছি আল্লাহ অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য জ্ঞান ও উপদেশ হিসেবে'।[৩৫]

সৃষ্ট জীবের খোরাক বিশেষ এই উৎপন্ন দ্রব্য সেখানকার জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মিটাবে এবং অন্য অংশে সরবরাহের ব্যবস্থাও হবে। সৃষ্টির জন্য তাঁর নিয়ামাত এত সূক্ষ্মভাবে উৎপাদিত হয় যে, ঋতু বৈচিত্রের তারতম্য সুনির্দিষ্ট নিয়মের কারণে মৌসুমি ফল ফসলের যথাযথ উৎপাদন অপচয় রোধপূর্বক পরিমিত পরিমাণেই তিনি সৃষ্টিকে ভারসাম্য বজায় রেখে দিয়ে

** সাবেক হিসাবরক্ষক, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদিস*

[৩৪] *সূরা গাফির, আয়াত : ৬৪*

[৩৫] *সূরা কাফ, আয়াত : ৬-৮*

থাকেন। এত এত নিয়ামত নিত্যপ্রয়োজনে নিরবিচ্ছিন্নভাবে মহান আল্লাহ পৃথিবীবাসীকে সেই শুরুর দিন থেকে দিয়েই চলেছেন। মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আসমান-জমিন ও এতদুভয়ের মাঝখানের সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির কাজ শুরু করে দুই দিনে তিনি জমিন সৃষ্টি করেছেন, তারপর পৃথিবী তথা জমিনকে স্থীরতা দেয়ার জন্য যেখানে যেখানে প্রয়োজন পাহাড়-পর্বত গেড়ে দিয়েছেন। এরপর আর দুই দিনে তাতে খাদ্য সন্নিবেশিত করেছেন। এই হলো চারদিন। অতঃপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন। এটি তখন ছিল ধোঁয়ার মতো। তারপর তিনি দুই দিনে আসমানকে সাতটি স্তরে সন্নিবেশিত করেন। প্রত্যেক আসমানে তিনি তাঁর বাণী প্রতিষ্ঠিত করেন। আর এক আসমান থেকে পরবর্তী আসমানের দূরত্ব ৫ শত বৎসরের পথ। আর নিকটবর্তী আসমানকে প্রদ্বীপমালা দ্বারা সাজিয়ে দেন। এই মোট ছয় দিনে আল্লাহ তা'আলা আসমান-জমিন সৃষ্টি করেন। (তবে সে দিনগুলো কত লম্বা তা আল্লাহই ভাল জানেন)।

আল্লাহ বলেন : 'নিশ্চয় তোমাদের রব আসমানসমূহ ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে উঠেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। প্রত্যেকটি একে অপরকে দ্রুত অনুসরণ করে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজি, যা তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত। জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। আল্লাহ মহান, যিনি সকল সৃষ্টির রব'।[৩৬] সর্বোচ্চ আকাশে অর্থাৎ ৭ তম আকাশের উপরে মহান আল্লাহর আরশ অবস্থিত যা' প্রথমে পানির ওপর ছিল।

আকাশ থেকে পানি, বাতাস, আলো, জমিন থেকে সু-স্বাদ সুসম খাবার রিযিক (ফল ফসল), ভূ-অভ্যন্তরের সুপেয় পানি, বিভিন্ন খনিজ সামগ্রী --আসমান-জমিনের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এ দুয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আর সকল সৃষ্টিই কিন্তু দয়াময় তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাঁর বান্দার জন্য অশেষ নিয়ামতরূপে সৃষ্টি করেছেন। জমিন থেকে পানি ও চারণভূমি বের করেছেন এবং তাতে এমনভাবে খাদ্য লুকিয়ে রেখেছেন, যা সব যুগের এবং সব স্থানের উপযোগী। ধান চাল গম যব খেজুর ইত্যাদি মানুষ ও জীবজন্তু পশু পাখি কীট পতঙ্গ উদ্ভিদের খাদ্য সময়োপযোগী নানা রকমের হয়, কোথাও না কোথাও থাকেই এবং আল্লাহই তা তাঁর ভাণ্ডার থেকে বণ্টন করে থাকেন এবং এই খাদ্যের প্রয়োজনে মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও যোগাযোগ গড়ে ওঠে। আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেনঃ' অতএব আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল উত্তম রিযক দিয়েছেন, তোমরা তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাক' ।[৩৭]

একইভাবে তিনি আসমানে চাঁদ, সূর্য ও তারকারাজি স্থাপন করে তাকে সুসজ্জিত করেছেন। সর্বক্ষণ উত্তরাকাশে স্থীর ধ্রুবতারা- এসবের দ্বারা দিশেহারা মানুষ সমুদ্রে ও স্থলে পথ খুঁজে পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন : তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, কীভাবে আল্লাহ স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন? আর এগুলোর মধ্যে চাঁদ সৃষ্টি করেছেন আলো এবং সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন প্রদ্বীপরূপে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে উদ্গাত করেছেন মাটি থেকে' ।[৩৮]

মহান আল্লাহর যা কিছু সৃষ্টি সবই তাঁর বান্দার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় অতি বিস্ময়কর! সাধারণ জ্ঞানে ক্ষুদ্র মস্তিস্কে সে রহস্য উদ্ঘাটন করা প্রায় অসম্ভব। এর মধ্যে মানব সৃষ্টি সেতো এক অনবদ্য বিস্ময়কর অনিন্দসুন্দর অবকাঠামো- তাও তার জোড়া (সঙ্গিনী) সহ।

এভাবে তাঁর সৃষ্ট সকল জীব, উদ্ভিদ, জড়-অজড়সহ সব কিছুই জোড়া জোড়া। কিন্তু এসব কিছুর স্রষ্টা হলেন বেজোড়। আল্লাহর কোনো জোড় নেই এবং তিনি একক। সূরা ইয়াছিন ৩৬, আয-যারিয়াত ৪৯ ও আরো কয়েক সূরায় সবকিছু জোড়া সৃষ্টির বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। সূরা ইয়াছিন ৩৬ আয়াতের তাফসিরে বলা হচ্ছে,

অর্থাৎ, মানুষের মতো পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকেও আমি নর ও মাদী করে সৃষ্টি করেছি। এছাড়া আকাশে ও মাটির নিম্নদেশে যে সকল বস্তু তোমাদের অদৃশ্য, যা

[৩৬] *সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত : ৫৪*

[৩৭] *সূরা আন-নাহল, আয়াত : ১১৪*

[৩৮] *সূরা নূহ, আয়াত : ১৫-১৭*

তোমাদের জ্ঞান-বহির্ভূত, তাদের মাঝেও জোড়া বা নর-মাদার এই নিয়ম রেখেছি। অতএব তোমরা সকল সৃষ্টিই জোড়া জোড়া। বৃক্ষাদির মাঝেও নর-মাদার একই নিয়ম আছে। এমনকি পরকালের জীবন ইহকালের জীবনের জোড়া সমতুল্য। শুধু এক আল্লাহর সত্তা; যিনি সৃষ্টি জগতের এই গুণ ও সকল প্রকার কমি ও ত্রুটি থেকে পবিত্র। তিনি একক, অদ্বিতীয়, বিজোড়; তাঁর কোনো জোড়া নেই। আয-যারিয়াত ৪৯-এর তাফসিরে আছে। অর্থাৎ, প্রতিটি জিনিস জোড়া জোড়া, নর ও নারী করেছি। অথবা ঐ জিনিসের বিপরীত জিনিসও সৃষ্টি করেছি। যেমন, আলো ও আঁধার, জল ও স্থল, চন্দ্র ও সূর্য, মিষ্ট ও তিক্ত, দিন ও রাত, ভালো ও মন্দ, জীবন ও মৃত্যু, ঈমান ও কুফরী, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, জান্নাত ও জাহান্নাম, মানব ও দানব ইত্যাদি। এমন কি জীবের বিপরীত জড়পদার্থও এই জন্য জরুরি যে, যাতে দুনিয়ারও জোড়া হয়। অর্থাৎ, দুনিয়ার মোকাবেলায় দ্বিতীয় জীবন আখেরাত। অর্থাৎ, এটা জেনে নাও যে, এ সবের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনি বলেনঃ

'জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে'।[৩৯] অংশী স্থাপন ব্যতিরেকে শিরকমুক্ত, তাওহীদের ওপর অনড় থেকে, মজবুত ঈমান নিয়ে সহি-সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমে জীবনকে প্রতিপালন করে মহান রবের নিকট দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে হাজিরা দেয়ার প্রত্যাশা হোক সকল মুমিন মুসলিমের কাম্য।

কেয়ামত কবে কখন সঙ্ঘটিত হবে তা 'আলিমুল গায়েব মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই অবগত নয়।[৪০] রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এমন দিন অপেক্ষা-যাতে সূর্য উদিত হয়, জুমুআর দিনই উত্তম। তাতেই হযরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়ছে; তাতেই তাঁকে (দুনিয়াতে) অবতীর্ণ করা হয়ছে; তাতেই তাঁর তওবা কবূল করা হয়ছে আর তাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাতেই কেয়ামত কায়েম হবে। কেয়ামত কায়েম হবার ভয়ে জুমুআবারে উষার প্রারম্ভ থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত সকল প্রাণীই চীৎকার করতে থাকে, জ্বিন ও মানুষ ব্যতীত। এছাড়া অন্য এক আলামত হলো- সূর্যকে যখন আল্লাহ পূর্ব দিগন্তে উদয়ের অনুমতি না দিয়ে বলবেন, যেখান থেকে এসেছো অর্থাৎ পশ্চিমাকাশে ফিরে যাও। বোখারির আর একটি হাদিসে জিবরীল ﷺ-এর সাথে রাসূল ﷺ যে আলামতের বর্ণনা তা হলো- জিবরীল ﷺ বললেন, আমাকে এর আলামত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা হলো এই যে, দাসী তার প্রভুর জননী হবে; আর নগ্নপদ, বিবস্ত্রদেহ ও পরমুখাপেক্ষী দরিদ্র মেষপালকদের বিরাট বিরাট অট্টালিকার প্রতিযোগিতায় গর্বিত দেখতে পাবে। বিধর্মী, কাফেররাও আল্লাহর দেয়া এই পৃথিবীর আলো বাতাস রিযিক সবই গ্রহণ করে বেঁচে থাকে কিন্তু মহান আল্লাহর প্রতি ঘোরতর অবিশ্বাসী পৃথিবীর লয় হবার পরে কেয়ামতের মাঠে তাদের জন্য ফয়সালা করতে আল্লাহর নিমেষমাত্র সময়ও লাগবে না। অতএব, ফিরে আসুন, আল্লাহর বিধান - কুরআনের নির্দেশনা মেনে একাগ্রচিত্তে আর কখনো অবিশ্বাসী না হওয়ার শর্তে খাস তাওবা করে সঠিক ইসলামকে অন্তরে গ্রোথিত করুন। হে মহান রব! সকলকে হিদায়াত দান করুন। আমিন। ❑❑

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে গোরস্থানে পরিণত করো না। যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয় তাতে শয়তান প্রবেশ করে না

(সহীহ মুসলিম হা : ১৮৬০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সাধারণ দরিদ্র ব্যক্তিকে সদকা দিলে কেবল সদকার সওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়কে সদকা করলে সদকাহও হবে এবং আত্মীয় রক্ষা হবে।

(তিরমিযী হা : ৬৫৮)

[৩৯] *সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত : ৫৬*
[৪০] *সহীহ বুখারী, হা : ১৩৫৯*

বিশ্বনবী মোহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত হতে পেরে আমরাই সৌভাগ্যবান

অধ্যাপক মোঃ আবুল খায়ের★

অত্র লেখার শিরোনামে আমরাই সৌভাগ্যবান। এখানে আমরা বলতে কারা এ প্রশ্নটি আসা নিতান্তই স্বাভাবিক। মূলত : আমরা বলতে এখানে শুধুমাত্র তাদেরকেই বলা হয়েছে যারা বিশ্বনবী মোহাম্মদ ﷺ-কে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হিসেবে এবং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে তামাম বিশ্বের একচ্ছত্র মালিক বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস এবং স্বীকার করে তাদেরকেই বলা হয়েছে। আবার প্রশ্ন হচ্ছে কেন সৌভাগ্যবান? দেখুন মানুষ যখন চতুর্দিক থেকে বিভিন্ন সমস্যার বেড়াজালে আটকে পড়ে, বের হওয়ার কোনো পথ খুঁজে পায় না তখন যদি কেউ বের হওয়ার সুযোগ করে দেয়, তাহলে আমরা কি তাকে কখনও ভুলতে পারবো? অবশ্যই না। আর যদি এইরূপ উদ্ধারের ঘোষণাটি পূর্ব হতেই আমরা যারা বিশ্বনবী মোহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত বলে দাবি করি তারা জানতে পারি তাহলে কি একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় না যে, আমরাই সৌভাগ্যবান? এখন দেখা যাক সেই মুসিবতের চরম দুর্দিনে কে আমাদের জন্য একটু সাহায্যের হাতটি বাড়িয়ে দেন। আমাদের প্রাণপ্রিয় বিশ্বনবী মোহাম্মদ ﷺ না অন্য কেউ?

হযরত আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন সেই কঠিন মুসিবতের সময়ে মুমিনগণকে হাশরের ময়দানে স্ব স্ব অপরাধের কারণে আটকে রাখা হবে। ফলে তারা অত্যন্ত চিন্তিত ও অস্থির হয়ে পড়বে এবং বলতে থাকবে যদি আমরা আমাদের প্রতিপালক সেই আল্লাহ তা'আলার নিকট কারোর মাধ্যমে সুপারিশ করতে পারতাম যিনি আমাদের বর্তমান এ অবস্থা থেকে স্বস্তি দিবেন। এ লক্ষ্যে তারা প্রথমে হযরত আদম عليه السلام-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলবে, আপনি মানব জাতির পিতা, আপনাকে আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, জান্নাতে বসবাস করিয়েছেন, ফেরেশতামণ্ডলীকে দিয়ে আপনাকে সিজদা করিয়েছিলেন এবং যাবতীয় বস্তুর নাম আপনাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আপনি আমাদের জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট সুপারিশ করুন, যেন আমরা আমাদের এ স্থানে শান্তি লাভ করতে পারি। একথা শুনে তিনি উত্তরে বলবেন; আমার এ যোগ্যতা নেই।

নবী মোহাম্মদ ﷺ বলেন, তখন তিনি গাছ হতে ফল খাওয়ার অপরাধের কথা স্মরণ করবেন, যা হতে তাঁকে নিষেধ করা হয়েছিল। সুতরাং তিনি লজ্জিত হয়ে বলবেন, তোমরা মানব জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সর্বপ্রথম নবী নুহ عليه السلام-এর নিকট যাও। তারা নূহ عليه السلام-এর নিকট আসলে তিনি তাদের বলবেন, আমি তোমাদের ঐ কাজের জন্য একেবারেই যোগ্য নই, সাথে সাথে তিনি তাঁর ঐ অপরাধের কথা স্মরণ করবেন। যা অজ্ঞতাবশত নিজের অবাধ্য ছেলেকে পানিতে না ডোবানোর জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। এ জন্য তিনি লজ্জিত হবেন এবং বলবেন তোমরা আল্লাহর খলিল হযরত ইবরাহীম عليه السلام-এর নিকট যাও।

রাসূল ﷺ বলেন, এবার তারা হযরত ইবরাহীম عليه السلام-এর নিকটে যাবে। তখন তিনি বলবেন; আমি তোমাদের এ কাজের জন্য কিছুই করার ক্ষমতা রাখি না। সাথে সাথে তিনি তাঁর তিনটি মিথ্যা কথা বলা স্মরণ করবেন এবং বলবেন বরং তোমরা মূসা عليه السلام-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন একজন বান্দা যাঁকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাওরাত দান করেছিলেন, শুধু তাই নয়, তাঁর সাথে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কথা বলেছিলেন এবং অনেক কথাবার্তার মাধ্যমে তাঁকে নৈকট্য দান করেছেন। রাসূল ﷺ বলেন : তখন তারা সকলেই হযরত মূসা عليه السلام-এর নিকটে আসলে তিনি বলবেন আমি তোমাদের জন্য সুপারিশের ক্ষেত্রে আপারগ। সাথে সাথে তাঁর সেই কিবতী হত্যার কথা স্মরণ হবে যা তিনি নিজেই ঘটিয়েছিলেন এবং বলবেন বরং তোমরা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর মনোনীত রাসূল, তাঁর কালেমা ও রূহ হযরত ঈসা عليه السلام-এর কাছে যাও।

★ *সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ, কলারোয়া। সাতক্ষীরা ও খতীব মুরারী কাটি জমঈয়তে আহলে হাদীস জামে মসজিদ।*

রাসূল ﷺ বলেন, তখন তারা সবাই হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে গেলে তিনি বলবেন : আমি তোমাদের ঐ কাজের জন্য উপযুক্ত নই। রবং তোমরা নবী মোহাম্মদ ﷺ-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ তা'আলার এমন এক বান্দা, যার পূর্বের এবং পরের সকল গোনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। রাসূল ﷺ বলেন : তখন তারা সাবাই আমার কাছে আসবে। আমি তখন আমার রবের কাছে তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করবো।

অতঃপর, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে তাঁর নিকটে যাওয়ার অনুমতি দিবেন। আমি যখন আমার রবকে দেখব, তখনই তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ আমাকে যতক্ষণ চাইবেন সিজদা অবস্থায় রাখবেন। অতঃপর বলবেন, হে মোহাম্মদ মাথা ওঠাও আর যা বলার বল, তোমার কথা শোনা হবে। শাফা'আত কর, কবুল করা হবে, তুমি চাও, তোমাকে দেওয়া হবে।

রাসূল ﷺ বলেন, তখন আমি মাথা ওঠাব এবং আমার রবের এমনভাবে প্রশংসা করবো যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। অতঃপর আমি শাফাআত করবো। তবে এ ব্যাপারে আমাকে একটা সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। তখন আমি আল্লাহর দরবার হতে উঠে আসব এবং ঐ নির্ধারিত সীমার লোকদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। তারপর আমি পুণরায় ফিরে এসে আমার প্রতিপালকের দরবারে হাজির হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করবো। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি যখন আমার প্রতিপালককে দেখব তখনই তাঁর উদ্দেশে সিজদায় পড়ে যাব এবং আমার আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন আমাকে সিজদার অবস্থায় থাকতে দিবেন। তারপর আল্লাহ বলবেন, হে মোহাম্মদ! মাথা ওঠাও আর যা বলার বল, তোমার কথা শোনা হবে, সুপারিশ কর কবুল করা হবে। তুমি প্রার্থনা কর, যা প্রার্থনা করবে তা দেওয়া হবে। রাসূল ﷺ বলেন, তখন আমি মাথা ওঠাব এবং আমার রবের এমনভাবে প্রশংসা করবো ও গুনাকীর্তন বর্ণনা করব, যা আমাকে শিখিয়ে দেওয়া হবে। এরপর আমি শাফাআত করব। তবে এ ব্যাপারে আমার জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দেওয়া হবে। তখন আমি আমার রবের দরবার হতে উঠে আসব এবং ঐ নির্দিষ্ট লোকগুলোকে জাহান্নাম হতে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। অতঃপর তৃতীয়বার ফিরে আসব এবং আমার প্রতিপালকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। আমি যখন তাঁকে দেখব, তখনই সিজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ পর্যন্ত সিজদাহ অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন হে মোহাম্মদ, মাথা ওঠাও। তুমি যা বলবে তা শোনা হবে, সুপারিশ কর, কবুল করা হবে। প্রার্থনা কর তা দেওয়া হবে। রাসূল ﷺ বলেন, তখন আমি মাথা ওঠাব এবং আমার রবের এমন হামদ ও সানা বর্ণনা করব, যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। রাসূল ﷺ বলেন, তখন আমি শাফাআত করব। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দেবেন। তখন আমি সেই দরবার থেকে বের হয়ে আসব এবং তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব।

অবশেষে কুরআন যাদেরকে আটক রাখবে (অর্থাৎ যাদের জন্য কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে গেছে) তারা ব্যতীত আর কেউ জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে না। বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, অতঃপর রাসূল ﷺ কুরআনের সূরা বনী ইসরাইলের ৭৯ নং আয়াতটি যথা :

عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

অর্থ, আশা করা যায় আপনার প্রতিপালক অচিরেই আপনাকে 'মাকামে মাহমুদে পৌঁছিয়ে দেবেন' তেলওয়াত করলেন এবং বলবেন, এটাই সেই মাকামে মাহমুদ। যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের নবীকে দেওয়া হয়েছে।[৪১]

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনা মোতাবেক আমরা যারা নিজেদেরকে শেষ নবীর উম্মত হিসেবে দাবি করি তাদের অন্তত : .....

(বাকী অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

[৪১] *সহীহ বুখারী, হা : ৭৪৪০, মিশকাত, হা : ৫৫৭২*

বিয়েভীতির প্রতিকার কোন পথে?

মীযান মুহাম্মদ হাসান*

মানুষ মাত্রই পরিবার ও সমাজ নিয়ে বসবাস। মা-বাবা, ভাই-বোন মিলেই আমাদের পরিবার। আবার স্ত্রী-সন্তান ও সংসারের সমষ্টিও পরিবার। আর পরিবার গঠনের লক্ষ্যেই অচেনা অজানা নারী ও পুরুষের মাঝে বৈধ পন্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। এটাই সামাজিক রীতি এবং প্রচলন। পুরুষ হিসাবে জীবনসঙ্গী একজন নারীর দায়িত্বভার গ্রহণ করা। এটাই বাস্তবতা। এটাই ইসলামের শিক্ষা।

টাকা-পয়সা উপার্জন, গাড়ি-বাড়ি সবকিছুই ব্যক্তি ও পরিবারের জন্য। পরিবারের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ করা, আরাম আয়েশে জীবন যাপন করা, এইতো আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য? না বিশেষ আরো কিছু আছে বলে মনে হয়?

কিন্তু পরিণত বয়সের একজন যুবক আজ যথাসময়ে বিয়ে করতে পারে না, পারছে না।

অর্থের অভাবে, ক্যারিয়ার ডেভেলাপ না হওয়া এবং উচ্চশিক্ষা অপূর্ণ থাকা প্রভৃতি কারণে যুবকরা বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারছে না। অপরদিকে উচ্চশিক্ষা কিংবা জব ক্যারিয়ারের পেছনে ছুটে বহু নারী আজ বিয়ে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে চলছে। বিশ থেকে প্রায় ত্রিশ ছুঁই এমন মেয়ে আজ ঘরে ঘরে ভরে যাচ্ছে।

জীবনে টাকা-পয়সা ও অর্থকড়ি কোনো কিছুর প্রয়োজন না থাকলেও; কী নারী কী পুরুষ-উভয়ের জন্যই একজন জীবন সঙ্গীর প্রয়োজন আছে।

জীবনে চলার জন্য একজন মানুষের প্রয়োজন আছে, যে সুখ-দুঃখের সঙ্গী হবে।

সবসময় পাশে থাকবে। কান্না হাসির অংশ হবে। অবসর সময়ে গল্প করবে। পাশে থাকবে।

* লেখক : ইসলাম বিষয়ক গবেষক ও সাংবাদিক, সাবেক খতিব, বৈরসগীরচালা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, শ্রীপুর, গাজীপুর

এটাই জীবন। হোক তাতে সংগ্রাম। চলুক শত সংঘাত ও সংঘর্ষ।

শুধু পয়সাকড়ি। ক্ষণিকের বন্ধু-বান্ধবী। এগুলো মরীচিকা। এসব তো ক্ষণিকের। স্বার্থের। হেসে খেলে ঘুরে ফিরে দিন শেষ করা তো কোনো জীবন হতে পারে না!

আজ বড়ো ব্যথিত হৃদয় নিয়ে লিখতে হচ্ছে - বিয়ে ভীতি বাড়ছে সমাজে। যুবক-যুবতীরা বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে ভয় পাচ্ছে। তারা সমাজের নানাবিধ অসামাজিক আচরণ, তালাক ডিভোর্স পরকীয়া ইত্যাদির প্রচার প্রসারে বিয়ে করতে ভয় পাচ্ছে। দৈনিক প্রথম আলো বলছে- রাজধানী ঢাকায় প্রতি মিনিটে একটি ডিভোর্স হচ্ছে।[৪২]

সমাজ বিজ্ঞানীরা বলছেন, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে সম্মান-শ্রদ্ধা-ভক্তি না থাকায় তালাক-ডিভোর্স বাড়ছে। দাম্পত্য কলহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি তারা বলছেন, শিক্ষিত নারীরাই ডিভোর্সের শীর্ষে। এছাড়া শ্বশুর শ্বাশুড়ির সঙ্গে বনিবনা না হওয়া, সংসারে অশান্তি; এসব কারণেও অনেক তরুণ-তরুণী বিয়ে করতে ভয় পাচ্ছে।

দাম্পত্য জীবন থেকে দূরে সরে কেউ বা লিভ টুগেদারকে বেছে নিচ্ছে। বিয়ের উপযুক্ত ছেলে মেয়েরা বিভিন্ন জায়গায় ট্যুর দিয়ে, বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে ঘুরে ফিরে মাস্তি করে জীবন যৌবন পার করে চলছে। এসবের মধ্যে আনন্দ বিনোদন খুঁজে ফিরছে।

তবে এর ভেতরও অজানা রহস্য লুকিয়ে আছে। যে রহস্যের জট খোলা বড় মুশকিল। তারা মনে করছে এই তো জীবন হেসে খেলে ফূর্তি করে শেষ হবে। এখানেই কি জীবনের শেষ?

তরুণ প্রজন্মকে মনে রাখতে হবে- জীবনে কেউ কখনো সুখী হয় না, হবে না। ভালো মন্দ দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ বিসর্জন দিয়েই চলতে হবে সংসার-জীবন নামের এ পথে। এটাই বাস্তব কথা। কষ্ট ক্লেশ, অশান্তি ও যাতনার মধ্য দিয়েই নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে হবে,

[৪২] ১৩/০৮/২৩

মানতে হবে অনেক কিছু। এর নাম জীবন। এই হলো আমাদের সংগ্রাম!

এর চেয়ে বড় কথা হলো, মানুষ চাই সে নারী বা পুরুষ যাই হোক, প্রত্যেকেই বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গীর প্রতি মুখাপেক্ষী। বিভিন্ন কারণে। একজন আরেকজনের জন্য আবশ্যিক। এজন্য পবিত্র কুরআনে স্বামী-স্ত্রীর বিষয়টাকে পোশাকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তারা নারীরা তোমাদের পোশাকস্বরূপ, তোমরা পুরুষরা নারীদের জন্য পোশাকস্বরূপ।[৪৩]

একইভাবে কুরআনের আরো একটি আয়াত এই নির্দেশনা প্রদান করে যে, মানুষের সৃষ্টিও জোড়া জোড়া করে।

'আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়াবদ্ধ করে'।[৪৪]

সুতরাং এখান থেকেও বোঝা যায়, মানুষ একা জীবন যাপন করতে পারে না। তার জন্য অবশ্যই জোড়া বা সঙ্গী একজন আছে।

কাজেই হতাশার কোনো কারণ নেই, যুবকদের উদ্দেশ্য করে বলবো, বিয়েভীতি দূর করুন। কখনো হতাশ হবেন না। নিয়মিত সালাত আদায় ও দুআর আমল এবং দরুদ ও এস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চান। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আপনার জন্য উত্তম জোড়া তথা উত্তম জীবন সঙ্গীর ব্যবস্থা করবেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের যুব সমাজকে হেফাজত করুন। তাদের আমল আখলাক আকিদা আদর্শ ঠিক রেখে ঈমানের ওপর অটল অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন ❐❑

তিনিই জীবন ও মরণ দান করেন এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

সূরা ইউনুস (মক্কায় অবতীর্ণ), আয়াত : ৫৬

[৪৩] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৮৭*
[৪৪] *সূরা আন-নাবা, আয়াত : ৮*

বিশ্ব নবী মোহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত হতে পেরে আমরাই সৌভাগ্যবান

(৩১ পৃষ্ঠার পর থেকে শুরু)

একটি বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার হয়েছে যে, কাল সেই বিভীষিকাময় কঠিন মুসিবতের দিনে সকলেই যখন দিশাহারা পথিকের মতো চারদিকে ছোটাছুটি করতে থাকবে। আর তখন সেই কঠিন মুসিবত থেকে কোনো নবী রাসূল পীর আওলিয়ার এমনকি জন্মদাতা পিতা-মাতা, স্ত্রী পুত্র-কন্যা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কেউই ন্যূনতম সহযোগিতা করতে পারবে না। পারবেন শুধুমাত্র আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ ﷺ। এ জন্যই পবিত্র কুরআনুল কারিমের সূরা আলে-ইমরানের ৩১ নং আয়াতের মাধ্যমে তাঁর নবীর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদেরকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

অর্থ, তুমি বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ করতে হবে। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ অতীশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। অর্থাৎ পরিষ্কার কথা যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে ভালোবাসতে চায় তাদেরকে অবশ্যই রাসূল ﷺ-কে ভালবাসতে হবে। এ প্রসংগে সূরা নিসা ৮০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, অর্থ কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করলো।

সুতরাং রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসা ছাড়া কাল সেই কঠিন মুসিবতের দিনে আমাদের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে সুপারিশ করার মতো একজনকেও পাওয়া যাবে না যেটা কুরআন এবং হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হল।

আর এ কারণেই আমরা যারা রাসূল ﷺ-এর উম্মত তারাই তো মহাসৌভাগ্যবান। হে আল্লাহ! আমরা যেন রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ করে অন্তর দিয়ে ভালোবেসে তাঁর আনুগত্যশীল উম্মত হতে পারি, সে তাওফীক দান করুন, আমীন। ❐❑

ইসলামের সৌন্দর্য

সাইদুর রহমান*

প্রিয়, সত্যি কথা বলছি, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলাম জাগতিক ও পারলৌকিক ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয় খুব গুরুত্বের সাথে দৃষ্টি রেখেছে। আমরা মনে করি ইউরোপ, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি পশ্চিমা বিশ্ব কত সভ্য জাতি, কত রূপলাবণ্য জৌলুস আছে তাদের সভ্যতায়। আমি তোমাকে বলবো, তুমি যদি ইতিহাস অধ্যয়ন করো তাহলে তোমার কাছেই বিষয়টা প্রতিভাত হয়ে যাবে যে, তাদের অবস্থা কত বেখাপ্পা, নাজেহাল ও তমসাচ্ছন্ন ছিল। তাদের মাঝে কত কুসংস্কার ও অধার্মিক রীতি বিদ্যমান ছিল। তারা তো সবেমাত্র কিছুকাল পূর্বে সভ্য হয়েছে। আর এটাও সাধিত হয়েছে মুসলিমদের সত্যতা সংস্কৃতি ছিনতাইয়ের বদৌলতে। কিছু নামে মাত্র মুসলিম ইউরোপ ঘুরে এসে গল্পের পসরা বসায়। তাদের প্রশংসা করে মুখে ফেনা তুলে ফেলে। 'আহ কত সুন্দর তাদের রাস্তাঘাট! গগনচুম্বী বিশাল বিশাল দালান, অট্টালিকা সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে! কত নান্দনিক, চিত্তাকর্ষক অঙ্কনে মোড়ানো প্রাসাদগুলো! প্রকৃতি কত মনোরম মনোমুগ্ধকর, কোলাহলমুক্ত! মনের অজান্তেই তনুমন শিহরিত হওয়ার মতো স্থান! আর আমাদের মুসলিম দেশগুলোর কী ক্ষেত অবস্থা! যত্রতত্র ময়লা আবর্জনার স্তূপ, রাস্তাঘাটের কী বেহাল দশা। মনটাকে একটু চাঙ্গা করার জন্য নেই কোলাহলমুক্ত নির্জন জায়গা। কী এক বিদ্ঘুটে দেশে বসবাস করিরে আমরা!' অনেক ভাইয়ের কাছ থেকে মাঝেমধ্যেই শুনতে পাই। হিন্দুরা কত পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন পরিপাটি! প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠেই তারা ঘরদোর গুছিয়ে মনোরম করে রাখে! তাদের বাড়ির আঙ্গিনার আশপাশ কত পরিচ্ছন্ন! বাড়ির চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা রংয়ের নানা প্রজাতির হরেক রকম ফুল -ফলের দৃষ্টিনন্দন বাগান! তারা তাদের দোকানপাট খুলেই সবকিছু সুচারুরূপে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। দোকানের সামনে দিয়ে যেন ধূলোবালির আস্তরণ না পড়ে এজন্য পানি ছিটায়! কত ধোয়ামুছা করে! তারা কত রুচিশীল! কত সভ্য! আর আমাদের কী অবস্থা! গাধা গরু যেমন খায় আর লেদায় আমাদের অবস্থা সেরূপ। নিজেকে কীভাবে সভ্য করা যায় এ নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র চিন্তাভাবনা নেই। 'প্রিয় ভাইদের এসকল কথার প্রত্যুত্তরে আমি বলবো, ভাই, ইসলাম সম্পর্কে তোমার ন্যূনতম জ্ঞান নেই। তুমি ইসলাম নিয়ে লেখাপড়া করোনি। ইসলামী জ্ঞানের আশপাশে ঘেঁষার সময় পাওনি। ইসলামী জ্ঞানের পরিধি যে কত সর্বময় তা তুমি জানো না! ইসলামের সৌন্দর্য রূপলাবণ্য জৌলুস কত যে হৃদয় তা আমাদের অধিকাংশের জ্ঞানের অগোচরেই রয়ে গেছে। ইসলাম প্রতিটি ক্ষেত্রে পদচারণা করেছে। তোমার সাথে আজ এ বিষয়েই একটু কথা বলবো। তুমি বন্ধ চোখটা একটু খোলো। দেখো, ইসলাম তোমাকে তার সৌন্দর্য হাত উঁচিয়ে দেখাচ্ছে । নবী ﷺ বলেন,

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ.

'মানুষের স্বভাবগত বিষয় হলো পাঁচটি, খাতনা করা, নাভির নিচের পশম চেঁছে ফেলা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, গোফ ছাঁটা ও নখ কাটা'।[৪৫]

দেখলে ইসলাম কত সভ্য? ইসলামের বিধান কত সুন্দর চমৎকার! মানুষের গায়ে যেন দুর্গন্ধ না থাকে সেজন্য কত সুন্দর দৃষ্টি রেখেছে! এখন তোমার কাছে এগুলোর খানিকটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তুলে ধরছি। প্রথমে আসি খাতনার বিষয়টা নিয়ে। তুমি কি বলতে পারবে সর্বপ্রথম কার খাতনা করানো হয়? আচ্ছা থাক, চলো নবী ﷺ থেকেই শুনি।

اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ.

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আশি বছর বয়সের পর 'কাদূম নামক স্থানে নিজেই নিজের খাতনা করেন'।[৪৬]

এবার তো জানতে পারলে কে সর্বপ্রথম খাতনা করেছেন।

খাতনা করার হুকুমটা এবার জেনে নাও। খাতনা করা ওয়াজিব। যদিও অনেক বিদ্বান সুন্নাহ বলেছেন। কিন্তু ওয়াজিব হওয়াটাই বেশি যুক্তিযুক্ত। এর কারণ হলো আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী ﷺ-কে আদেশ করেছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর অনুসরণ করার জন্য।

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

* সাবেক ছাত্র, এম এম আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[৪৫] সহীহ বুখারী, হা : ৬২৯৭
[৪৬] সহীহ বুখারী, হা : ৬২৯৮

অতঃপর আমরা তোমাকে একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের অনুসরণ করতে আদেশ করছি। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।[৪৭]

আর আমাদের আদেশ করেছেন নবী ﷺ-এর আদেশ পালন করতে।

আর তোমাকে আমরা বলেছি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ৮০ বছর বয়সে খাতনা করেছেন। তাহলে বুঝা যাচ্ছে বিষয়টা কত গুরুত্বপূর্ণ! আমরা জানি নিজেকে কষ্ট দেয়া যাবে না। আর খাতনা করিয়ে নিজেকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে। এটা ওয়াজিব না হলে কখনোই নবী ﷺ এই আদেশ দিতেন না। খাতনা না করালে প্রস্রাব ভেতরে থেকে যায়। যার কারণে নাপাক ভেতরে থাকে। আর নাপাক থেকে বিরত থাকার জন্য আমাদের বলা হয়েছে। নাপাক নিয়ে সালাত আদায় করলে সালাত হবে না। এজন্যই খাতনা করা ওয়াজিব।

নবী ﷺ বলেন,

أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ.

'তুমি কাফের অবস্থার চুল ফেলে দাও ও খাতনা করে নাও'।[৪৮]

আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি বলবে নারীদেরও কি খাতনা করাতে হবে? যেমন কিছু হাদীসে পাওয়া যায়। এমনিভাবে বিধানের ক্ষেত্রে তো নারী পুরুষ সমান! তোমার প্রশ্নের উত্তর শোনো। পুরুষদের খাতনা করানো ওয়াজিব এটা পূর্বে তোমাকে বলেছি; কিন্তু নারীদের খাতনা করানো ওয়াজিব নয়। এটা দেশের আবহাওয়ার ভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যে দেশে শীতের প্রার্দুভাব বেশি যেমন : বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, কাশ্মীর, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ। ওই দেশের নারীদের খাতনা করানোর প্রয়োজন নেই। কারণ তাদের ভগাঙ্কুর এমনিতেই ছোট থাকে । আর নারীদের ভগাঙ্কুর বড় থাকলে কাটতে হয়। আর যে সকল দেশে উষ্ণতার প্রার্দুভাব বেশি যেমন : সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, দুবাই, ওমান, ইয়েমেন, মিসর ও আফ্রিকার দেশগুলো। ওই দেশের নারীদের খাতনা করাতে হয়। কারণ উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে তাদের ভগাঙ্কুর বড় হয়ে থাকে। তাই এটাকে কেটে ছোট করতে হয়। আর এ কথাই বলেছেন নাসিরউদ্দিন আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ফাতাওয়া আলবানীতে।[৪৯]

আমি এখানে আরো একটু কথা বৃদ্ধি করছি। অনেক নারী মাঝে মধ্যে প্রশ্ন করে থাকে, 'নাক কান ছিদ্র করা যাবে কিনা'। যেহেতু তারা নাকের ফুল ও কানের দুল তাতে পরে থাকে। কিছু নারী তো আরেকটু কৌতূহলী হয়ে বলে, 'এক কানে একাধিক ছিদ্র করা যাবে কিনা'। তাদের উত্তরটা এখানে দেয়া সমীচীন মনে করছি। নারীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শোভা সৌন্দর্য বর্ধন করা, পরিপাটি হয়ে থাকা, সাজসজ্জা করা। প্রতিটি নারীই সাজুগুজু করতে ভালোবাসে। এজন্যই তুমি দেখতে পাবে তোমার আশপাশে ছোট্ট মেয়েটা বা ভাতিজিটা মিছামিছি খেলনার সামগ্রী নিয়ে ভাত, তরকারি রান্না করে, শাড়ি পরিয়ে সাজুগুজু করে পুতুলের বিয়ে দেয়। খেলনার কসমেটিক নিয়ে সাজে। আরো নারীসূলভ কত কী করে। তুমি কিন্তু তোমার ছেলের মাঝে বা ভাতিজার মাঝে এই বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করো না। কারণ মহান রব নারীদের সৃষ্টিই করেছেন এই ধাঁচে। নারীরা যেহেতু সাজুগুজু প্রেমিক আর নাক-কানে ফুল ও দুল পরিধান করা হলো সাজুগুজুর বহিঃপ্রকাশ, সেহেতু তারা নাক-কানে ফুল ও দুল পরিধান করতে পারবে। এমনকি এক কানে একাধিক ছিদ্র করে দুল পরিধান করতে পারবে। নারী সাহাবীরা নাকে ফুল ও কানে দুল পরিধান করতেন। আচ্ছা তোমাকে প্রমাণ দিয়ে বলছি। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلٰى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ يَدْفَعْنَ إِلٰى بِلاَلٍ ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلاَلٌ إِلٰى بَيْتِهِ.

'রাসূল ﷺ বের হলেন। তারপর সালাত আদায় করলেন, এরপর খুৎবাহ দিলেন। এরপর তিনি মহিলাদের কাছে এলেন এবং তাদেরকে ওয়াজ ও নসীহাত করলেন ও তাদেরকে সাদাকাহ করার আদেশ দিলেন। আমি দেখলাম, তারা তাদের কর্ণ ও কণ্ঠের দিকে হাত প্রসারিত করে (গয়নাগুলো) বিলালের কাছে অর্পণ করছে। এরপর রাসূল ﷺ ও বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন'।[৫০]

[৪৭] *সূরা নাহল, আয়াত :* ১২৩
[৪৮] *আবু দাউদ, হা :* ৩৫৬
[৪৯] *ফাতাওয়ায়ে আলবানী,* ১৭৪ *পৃ.*
[৫০] *সহীহ বুখারী, হা :* ৫২৪৯

এই হাদীসে তুমি দেখলে নারীরা কান থেকে গহনা খুলে বেলালের হাতে দিচ্ছে। তাদের কান যদি ছিদ্র করা না থাকতো তাহলে কোথায় কানের দুল পরিধান করেছে? অতএব, বুঝা যাচ্ছে তারা কান ছিদ্র করতো। নবী ﷺ বলেছেন,

طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ .

'পুরুষের সুগন্ধি এমন হবে যার সুগন্ধ প্রকাশ পায় কিন্তু রং গোপন থাকে এবং নারীর সুগন্ধ এমন হবে যার রং প্রকাশ পায়; কিন্তু সুগন্ধ গোপন থাকে'।[৫১]

নবী ﷺ এই হাদীসে নারীদের শোভার কথা বলেছেন। আর তা হলো যার রং দেখা যায়। নাকের ফুল ও কানের দুলও দেখা যায়। সুতরাং-নারীরা নাক কান ছিদ্র করতে পারবে। এমনকি একাধিক ছিদ্র করাও জায়েজ আছে।

কিছু তরুণকে দেখতে পাই তারা নারীদের ন্যায় কান ছিদ্র করে। এটা সম্পূর্ণ হারাম। নবী ﷺ পুরুষদের নিষেধ করেছেন নারীদের বেশ ধারণ করতে। এমনকি তিনি অভিসম্পাত করেছেন।

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

'নবী ﷺ ওইসব পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন, যারা নারীর বেশ ধরে ও ওইসব নারীকে যারা পুরুষের বেশ ধরে'।[৫২]

তারপর তোমার সাথে কথা হলো কখন খাতনা করাতে হবে। বালেগ হলে নাকি এর আগেই? কিছু বিদ্বান বলেছেন, বালেগ হলে খাতনা করাতে হবে। এর আগে নয়। তাদের যুক্তি হলো, সালাত সিয়াম ও ইসলামের বিধান তো মূলত আবশ্যক হয় বালেগ হওয়ার পর, আগে নয়। তাই বালেগ হওয়ার পর খাতনা করাতে হবে। আর কিছু বিদ্বান বলেন, বালেগ হওয়ার আগে করাতে হবে। তাদের প্রমাণ হলো-

عقَّ رسولُ اللهِ ﷺ عن الحسنِ والحسينِ وختنهما لِسبعةِ أيامٍ.

'রাসূল ﷺ হাসান ও হুসাইনের পক্ষ থেকে আকীকা করেন এবং সপ্তম দিন খাতনা করান'।[৫৩]

[৫১] *তিরমিযী হা : ২৭৮৭*
[৫২] *সহীহ বুখারী, হা : ৫৮৮৫*
[৫৩] *আবু ইয়ালা, হাদীসের সনদ দুর্বল, হা : ১৯৩৩*

তাদের এই হাদীস দুর্বল। তবে এর ওপর আমল রয়েছে। আমরা মনে করি বাচ্চার খাতনা করানোর নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। তবে ছোটকালে করালেই ভালো হয়। কারণ এই বয়সে বাচ্চার চামড়া পাতলা থাকে, যার ফলে কষ্ট কম হয়। আর বালেগ হওয়ার পর খাতনা করানো মাকরূহ। ইবনুল কাইয়ুম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'প্রাপ্ত বয়স হওয়ার আগ পর্যন্ত খাতনা না করানো এটা অভিভাবকদের জন্য জায়েয নয়'।[৫৪]

প্রসঙ্গত একটা কথা বলি, অনেকেই অনর্থক একটা প্রশ্ন করে জ্বালাতন করে। বলে, নবী ﷺ-এর কখন খাতনা করানো হয়। বাধ্য হয়ে তাদের এই অনর্থক প্রশ্নের উত্তর দিলাম। এ ব্যাপারে তিনটা মত রয়েছে।

(১) নবী ﷺ খাতনা করা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন। এ মতের পক্ষে যত হাদীস আছে সব নিতান্তই দুর্বল। তাই এটা সঠিক মত নয়।

(২) হালিমা সাদিয়ার গৃহে থাকাকালীন সময় রাসূল ﷺ-এর বুক চেরার সময় জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তার খাতনা করান। এ মতের পক্ষেও যত হাদীস আছে সব নিতান্তই দুর্বল। তাই এ মতও সঠিক নয়।

(৩) আরবের রীতি অনুসারে সপ্তম দিন তার দাদা আব্দুল মুত্তালিব খাতনা করান। এ মতটিই শক্তিশালী ও সঠিক। ইবনুল কাইয়ুম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তুহফাতুল মাওলুদ ও যাদুল মায়াদে এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

তোমার সাথে আমার পরের কথা হলো খাতনা করালে যদি কারো সমস্যা হয়। যেমন : ডাক্তার বলেছেন, খাতনা করালে রক্ত পড়া বন্ধ হবে না তাহলে এ ক্ষেত্রে খাতনা না করালে কোনো সমস্যা নেই। কারণ এখানে প্রাণনাশের সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

'তোমরা নিজেদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। অনুগ্রহ করো, নিশ্চয় আল্লাহ অনুগ্রহশীলদের ভালোবাসেন'।[৫৫]

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

'তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল'।[৫৬]

[৫৪] *ফাতাওয়ায়ে আলবানী, ১৭৪ পৃ.*
[৫৫] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৯৫*

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, কঠিন করতে চান না।[৫৭]

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

'তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো'।[৫৮]

রাসূল ﷺ বলেছেন,

وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

'যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের আদেশ করি তাহলে সাধ্যানুযায়ী তা মেনে চলবে'।[৫৯]

তুমি ঘুমিয়ে আছো। গভীর ঘুমে বিভোর। কী জানি নিয়ে স্বপ্নের রাজ্যে বিচরণ করছো। হঠাৎ তোমার মা ডাক দিলো। এই, উঠ তাড়াতাড়ি। পাশের বাড়ির অমুকের ছেলের ঘুমের মধ্যেই খাতনা (মুসলমানী) হয়ে গেছে। তুমি ঘুম বাদ দিয়ে হুড়মুড় করে তাদের বাড়িতে গেলে। গিয়ে দেখলে ঘটনা সত্যই। এখন তোমার মনে প্রশ্ন এসে ভিড় জমাল 'এই ছেলেকে কি পূণরায় খাতনা করাতে হবে'? আমার কাছ থেকে শুনো। এই ছেলেকে আর পুনরায় খাতনা করাতে হবে না। কারণ তার তো খাতনা হয়েই গেছে। তবে যদি পরিপূর্ণ খাতনা না হয়ে থাকে তাহলে ভালো করে খাতনা করাবে। শাফী মাজহাবের কিছু বিদ্বান বলেন, কারো খাতনা হয়ে গেলে লজ্জাস্থান কাটা বাদ দিয়ে ছুরি এমনিতেই চালাবে। কিন্তু এ কথার পেছনে বিশুদ্ধ দলীল নেই।[৬০]

এক নাস্তিকের প্রশ্নের উত্তর। ফেইসবুকে লাইভে এক নাস্তিক এসে বলছে, তোমাদের আল্লাহ কুরআনে বলেছে,

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

আমরা মানুষদের সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছি।[৬১]

মানুষকে যদি সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করে থাকেন তাহলে আবার খাতনা করিয়ে সুন্দর করতে হয় কেন? একটা কথা ভালো করে স্মরণ রাখবে। নাস্তিকদের কাজেই হলো ইসলামের বিধান নিয়ে সমালোচনা করা। তারা আসলে নাস্তিক নয়; তারা ইসলামবিদ্বেষী। তারা তো ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম নিয়ে সমালোচনা করে না। তাদের উত্তরটা শোনো। যে আল্লাহ আমাদের সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। আমরা তার আদেশেই এই সুন্দরটা কাটি। আমাদের কাজই হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা মান্য করা। ইবলিসের মতো আমরা তর্ক করবো না। মুমিনদের কাজ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা শোনার সাথে সাথে তা বাস্তবায়ন করা। যেমনটা করেছেন ইবরাহীম عليه السلام।

কোনো ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তারও কি খাতনা করাতে হবে? হ্যাঁ, তারও খাতনা করতে হবে। এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে নবী ﷺ তাকে বলেন,

أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ .

তুমি কাফের অবস্থার চুল ফেলে দাও ও খাতনা করে নাও।[৬২]

তবে যদি বড় হওয়ার কারণে খাতনা করালে সমস্যা হয় তাহলে খাতনা না করালেও চলবে। আল্লাহ বলেন,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো।[৬৩]

মৃত ব্যক্তির যদি খাতনা করানো না থাকে তাহলে তাকে আর খাতনা করাতে হবে না। কারণ মৃত্যুবরণ করার কারণে তার থেকে দায়িত্ব উঠে গেছে। তাই জীবিত ব্যক্তিদের তার আর খাতনা করানোর প্রয়োজন নেই।

তোমার তো খাতনা করানো শেষ হয়ে গেছে। তো খাতনাকারীকে পারিশ্রমিক দিতে হবে না? হ্যাঁ, খাতনাকারীকে অবশ্যই পারিশ্রমিক দিতে হবে, যেমন অপারেশনকারীকে পারিশ্রমিক দিতে হয়। কারণ খাতনা করানোটাও একটা অপারেশন। নবী ﷺ বলেছেন,

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ .

শ্রমিকের দেহের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার মজুরী দাও।[৬৪]

তুমি তোমার আশপাশে সপ্তাহখানেক বাদে বাদেই দেখতে পাবে খাতনার (মুসলমানীর) জাঁকজমকপূর্ণ ভোজন অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেই শুরু হয় নাচ গান। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। অনেক জায়গায়

[৫৬] *সূরা আন-নিসা, আয়াত : ২৯*
[৫৭] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৮৫*
[৫৮] *সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত : ১৬*
[৫৯] *সহীহ বুখারী, হা : ৭২৮৮*
[৬০] *ফাতহুল বারী, ১৩ খণ্ড, ৩৩০ পৃ., হা : ৫৮৮৮*
[৬১] *সূরা আত-তীন, আয়াত : ৪*
[৬২] *আবু দাউদ, হা : ৩৫৬*
[৬৩] *সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত : ১৬*
[৬৪] *ইবনু মাজাহ, হা : ২৪৪৩*

চোখের ও মুখের জিনার প্রসরা সাজিয়ে বসে। রাতভর আনন্দ উল্লাস, হৈ হুল্লোড় করে মানুষের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটিয়ে কষ্ট দেয়। শুক্রবার দিন কাচের একটা সাদা জগ, এক বক্স টিস্যু ও পান-সুপারি রেখে ব্যবসা শুরু করে। এ ধরনের খাতনার অনুষ্ঠান কি বৈধ ও সেই অনুষ্ঠানে কি অংশগ্রহণ করা বৈধ হবে?

উত্তরটা শোনো। এ ধরনের অনুষ্ঠান করা বৈধ নয়। এর কয়েকটি কারণ দেখো। এ সকল অনুষ্ঠানে সম্পদের অপচয় হয়। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ অপচয় করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

হে আদম সন্তান! মসজিদে গমনকালে সাজসজ্জা গ্রহণ করো। পানাহার করো, তবে অপচয় করবে না। নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) অপচয় পছন্দ করেন না।[৬৫]

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾

নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তো তার রবের অকৃতজ্ঞ।[৬৬]

নবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ.

আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজ অপছন্দ করেন, (১) অনর্থক বেশি বেশি প্রশ্ন করা, (২) সম্পদ নষ্ট করা ও (৩) অত্যধিক (মানুষের কাছে) চাওয়া ।[৬৭]

এ সকল অনুষ্ঠানে জিনা-ব্যভিচারের রুদ্ধ পথ খুলে যায়। অনেক ক্ষেত্রে প্রেম ভালোবাসার সূত্রপাত ঘটে। আর আল্লাহ ব্যভিচার থেকে বহুদূরে থাকতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যাবে না। নিশ্চয় এটা অশ্লীলতা ও মন্দ পথ।[৬৮]

চোখের জিনা হরহামেশা হয়। চোখ সংযত রাখা দুস্কর। আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾

(হে নবী) মুমিনদের বলো, তারা যেন দৃষ্টি অবনত রাখে ও লজ্জাস্থানের হেফাজত করে । এটা তাদের জন্য পবিত্রতা। নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা করো তার খবর রাখেন।[৬৯]

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾

(হে নবী) মুমিন নারীদেরকে বলো, তারা যেন দৃষ্টি অবনত রাখে ও লজ্জাস্থানের হেফাজত করে ।[৭০]

এ সকল খাতনার অনুষ্ঠানে তুমি ভুলেও যাবে না। কারণ গেলে তুমি মন্দ কাজে সহযোগিতা করলে। আর আল্লাহ আমাদের মন্দ কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন।

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

কল্যাণ ও আল্লাহভীতির কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো, পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করবে না।[৭১]

এখন কথা হলো কেউ যদি এভাবে অনুষ্ঠান না করে এমনিতেই আত্মীয়-স্বজনদের খাওয়ায় তাহলে এই অনুষ্ঠান করা বৈধ আছে ও এ সকল অনুষ্ঠানে যাওয়া যাবে। ইবনু কুদামা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মুগনী কিতাবে বলেন, 'খাতনার অনুষ্ঠান করে এমনিতেই আত্মীয়-স্বজনদের খাওয়ানো যাবে'। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে খাতনার অনুষ্ঠানে দাওয়াত করলে তিনি সেখানে যান। (ইসলামিক ওয়েব, ইনফো ও দুরার নেট) সুতরাং আমাদের বোধগম্য হলো যে, কেউ যদি অপচয়, অশ্লীলতা ও গান-বাজনা পরিহার করে এমনিতেই আত্মীয়-স্বজনদের খাওয়ায় তাহলে এ অনুষ্ঠান করা বৈধ আছে ও এ অনুষ্ঠানে যাওয়া যাবে। আল্লাহ আমাদের সুবোধ দান করুন, আমীন। □□

[৬৫] *সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত : ৩১*
[৬৬] *সূরা আল-ইসরা, আয়াত : ২৭*
[৬৭] *সহীহ বুখারী, হা : ১৪৭৭*
[৬৮] *সূরা আল-ইসরা, আয়াত : ৩২*
[৬৯] *সূরা আন-নূর, আয়াত : ৩০*
[৭০] *সূরা আন-নূর, আয়াত : ৩১*
[৭১] *সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ২*

শুব্বান পাতা

صفحةالشبان

যে সকল আমল মিজানের পাল্লা হালকা করে

মাযহারুল ইসলাম ❋

মিযান (الميزان) শব্দটির আরবী অর্থ হলো- দাঁড়িপাল্লা, পরিমাপক যন্ত্র। ইসলামী শরীয়তে মিযান বলতে বুঝায় - কিয়ামতের মাঠে যা দ্বারা সৎকর্ম, অসৎ কর্ম পরিমাপ করা হবে। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকটে মিযান বাস্তবিকভাবে সংঘটিত হবে কোনো প্রকার রূপকভাবে নয়। মিযানের আলোচনা কুরআন, হাদিসের যত জায়গায় এসেছে সকল জায়গায় বাস্তব সঙ্গত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এটা সংঘটিত হবে কিয়ামতের ময়দানে। কোন প্রকার রূপক অর্থে কুরআন, হাদিসে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি। যার মিযানের পাল্লা ভারী হবে সে সফলকাম হবে আর যার মিযানের পাল্লা হালকা হবে সে অকৃতকার্য, ব্যর্থ হবে। মহান আল্লাহ বলেন -

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾

অর্থ- আর কিয়ামতের দিনে আমরা ন্যায়বিচারের পাল্লাসমূহ স্থাপন করব, সুতরাং কারো প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না এবং কাজ যদি শস্যদানা পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও তা আমরা উপস্থিত করব; আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমরাই যথেষ্ট।[৭২]

মিযানের বিষয়টি সম্পূর্ণ গায়েবি তথা অদৃশ্য। এর ওপর ঈমান আনা আবশ্যক। আর অস্বীকার করা কুফরী। মিযানের দুটি পাল্লা থাকবে। একটিতে সওয়াব রাখা হবে আর আরেকটিতে অসৎ কর্ম তথা পাপ রাখা হবে। অতঃপর ওজনে যার সওয়াবের পাল্লা ভারী হবে তার গন্তব্যস্থল জান্নাত, আর যার হালকা হবে তার আবাস নির্ধারণ হবে জাহান্নাম। প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তির জীবন সফল, সার্থক হবে যার মিযানের পাল্লা ভারী হবে ফলে সে জান্নাতী ব্যক্তিদের কাতারে শামিল হওয়ার তাওফীক পাবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ দান করুক আমিন।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে অনেক জায়গায় মিযানের কথা আলোচনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন থেকে মিযানের আলোচনার দৃষ্টান্ত -

﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

অর্থ- অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম।[৭৩]

﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾

অর্থ- আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।[৭৪]

﴿وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾

আর তাদেরকে আপনার রব-এর কাছে উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে এবং আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমাদেরকে আমরা প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছ, অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য আমরা কোনো প্রতিশ্রুত সময় নির্ধারণ করব না।[৭৫]

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾

অর্থ- তারাই সেসব লোক, যারা তাদের রব-এর নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের ব্যাপারে কুফরি করেছে। ফলে তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে; সুতরাং আমরা তাদের জন্য কেয়ামতের দিন কোনো ওজনের ব্যবস্থা রাখব না।[৭৬]

❋ *মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।*

[৭২] *সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৪৭*

[৭৩] *সূরা মুমিনুন, আয়াত : ১০২*

[৭৪] *সূরা মুমিনুন, আয়াত : ১০৩*

[৭৫] *সূরা কাহফ, আয়াত : ৪৯*

[৭৬] *সূরা কাহফ, আয়াত : ১০৫*

হাদিস থেকেঃ

১) ওমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন - ঈমান হলো -

আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর, তাঁর সকল কিতাবের ওপর, তাঁর সকল রাসূলগণের ওপর, জান্নাত, জাহান্নাম ও মিযানের ওপর, মৃত্যু পরবর্তী অদৃশ্যের ওপর এবং তাকদীরের ভালো, মন্দের ওপর ঈমান স্থাপন করা।[৭৭]

২) হাদিসে এসেছে - রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন -

আল্লাহ আমার উম্মতের মধ্যে এক লোককে কেয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে পৃথক করে একান্তে ডেকে তার জন্য ৯৯টি দফতর বের করবেন যার প্রত্যেকটি চোখ যতদুর যায় তত লম্বা হবে। তারপর তাকে বলবেন : "তুমি কি এগুলো অস্বীকার কর? আমার রক্ষণাবেক্ষণকারী লেখক ফেরেশতাগণ কি তোমার ওপর অত্যাচার করেছে? সে বলবে : না, হে প্রভু! তারপর আল্লাহ বলবেন : তোমার কি কোনো ওজর বা সৎকর্ম আছে? লোকটি তখন হতভম্ব হয়ে গিয়ে বলবে : না, হে প্রভু! তখন আল্লাহ বলবেন : অবশ্যই তোমার একটি সৎকর্ম আছে, তোমার ওপর আজ কোনো যুলুম করা হবে না। তারপর তার জন্য একটি কার্ড বের করা হবে যাতে আছে :

أَشْهَدُأن لَّا إله إلّا اللهُ، وأَنَّ مُحَمّدًا عَبْدُه وَ رَسُلُه.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো হক্ক ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। " তারপর আল্লাহ বলবেন : সেটা নিয়ে আস। তখন লোকটি বলবে : হে প্রভু! ঐ সমস্ত দফতরের বিপরীতে এ কার্ড কি ভূমিকা রাখতে পারে? তখন আল্লাহ বলবেন : তোমার ওপর যুলুম করা হবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : তারপর সে সমস্ত দফতর এক পাল্লায় এবং কার্ডটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে। রাসূল বললেন : আর তাতেই সমস্ত দফতর ওপরে উঠে যাবে এবং কার্ডটি ভারী হয়ে যাবে। আল্লাহর নামের বিপরীতে কোনো কিছু ভারী হতে পারে না।[৭৮]

[৭৭] *ইবনে হিব্বান-১৭৩, সহীহুল জামে-২৭৭৮, নাসিরউদ্দিন আলবানী (রহি.) সহীহ বলেছেন*
[৭৮] *তিরমিযী, হা : ২৬৩৯, ইবনে মাজাহ, হা : ৪৩০০*

৩) প্রসিদ্ধ হাদিসে বান্দার আমল ওজন করা হবে মর্মে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- "দুটি বাক্য এমন যা দয়াময়ের কাছে প্রিয়, জিহ্বায়ও হাল্কা, মীযানের মধ্যে ভারী, আর তা হলো: সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর প্রশংসা সহকারে), "সুবহানাল্লাহিল 'আজীম' (মহান আল্লাহ কতই না পবিত্র)"।[৭৯]

৪) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 'আরাক' গাছে উঠলেন, তিনি ছিলেন সরু গোড়ালীবিশিষ্ট মানুষ, ফলে বাতাস তাকে নাড়াচ্ছিল। তাতে উপস্থিত লোকেরা হেসে উঠল, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন : "তোমরা হাসছ কেন?" তারা বলল: হে আল্লাহর নবী! তার সরু গোড়ালীর কারণে। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : "যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, এ দু'টি মীযানের ওপর উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি ভারী"।[৮০]

✡ যে সকল আমল মিজানের পাল্লা হালকা করবে-

০১. ছোট পাপ (ছগীরা গুনাহ) : মিযানের পাল্লাকে যে সকল আমল হালকা করবে তন্মধ্যে ছগীরা গুনাহ তথা ছোট পাপ অন্যতম। একথা সর্ববিদিত যে সগীরা গুনাহ মহান আল্লাহ মাফ করে দিবেন, তবে শর্ত হলো - যাবতীয় কবিরা গুনাহ তথা বড় পাপ থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং সেই সাথে পাপকে তুচ্ছ্য জ্ঞান করা যাবে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী-

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾

অর্থ - তোমদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা কবীরা গোনাহ্ তা থেকে বিরত থাকলে আমরা তোমাদের ছোট পাপগুলো ক্ষমা করব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব।[৮১]

সাহাবী সাহল বিন সাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন - তোমরা সাবধান থাকো! পাপকে তুচ্ছ্য জ্ঞান করা থেকে।[৮২]

[৭৯] *সহীহ বুখারী, হা : ৭৫৬৩, সহীহ মুসলিম, হা : ২৬৯৪*
[৮০] *মুসনাদে আহমাদ- ১/৪২০-৪:২১, মুস্তাদরাক-৩/৩১৭*
[৮১] *সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৩১*
[৮২] *সহীহুল জামে, হা : ২৬৮৬, নাসিরউদ্দিন আলবানী (রহি:) সহীহ বলেছেন*

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন -

إِيَّاكُم ومُحَقَّراتِ الذُّنوبِ ، فإنَّهنَّ يجتمِعنَ على الرَّجلِ حتَّى يُهْلِكْنَهُ وإنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ضربَ لَهُنَّ مثلًا : كمثلِ قومٍ نزلوا بأرضٍ فلاةٍ ، فحضرَ صَنيعُ القومِ، فجعلَ الرَّجلُ ينطلقُ ، فيجيءُ بالعودِ، والرَّجلُ يجيءُ بالعودِ، حتَّى جمَعوا سَوادًا، وأجَّجوا نارًا ، فأنضَجوا ما قذَفوا فيها.

তোমরা কোনো পাপকেই ছোট মনে করবে না। এই ছোট্ট ছোট্ট পাপগুলোই জমা হয়ে একসময় ব্যক্তিকে ধ্বংস করে ছাড়বে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন - যেমন একটি জাতি কোনো বিরান ভূমিতে অবতরণ করল, এরপর সেখানে জাতির আসবাবপত্র রাখা হল। একজন ব্যক্তি সেখান থেকে বেরিয়ে গেল এবং সে একটি কাঠের খণ্ড নিয়ে ফিরে এল। আরেকজন ব্যক্তি সেও একটি কাঠের খণ্ড নিয়ে ফিরে এল। এভাবে বিশাল একটি স্তূপ জমে গেল। এরপর তারা আগুনে প্রজ্বলিত করলে আশেপাশের সব কিছুকে আগুনে জ্বালিয়ে দিল।[৮৩]

ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত - রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন - নিশ্চয় মুমিন ব্যক্তি তাঁর পাপকে এত বড় মনে করে যেন সে একটা পর্বতের নিচে বসে আছে, আর সে ভয় করছে যে, না জানি কখন পাহাড়টা ধসে পড়বে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁর গুনাহগুলোকে মাছির মতো মনে করে যা তার নাকের ডগায় বসে চলে যায় (একথা বলে হাদিসের রাবী শিহাব নিজ নাকে হাত দিয়ে ইশারা করে দেখিয়ে বলেন)।[৮৪] প্রখ্যাত সাহাবী আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন - নিশ্চয় তোমরা এমন অনেক আমল করো যা তোমাদের চোখে বা দৃষ্টিতে চুলের চেয়েও অধিক সূক্ষ্ম অথচ আমরা রাসূলের যুগে তা ধ্বংসকারী আমল হিসেবে গণণা করতাম।[৮৫]

ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, ইবনে বাত্তাল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন- পাপকে অবজ্ঞা, তুচ্ছ জ্ঞান করা এক পর্যায়ে কবীরা গুনাহতে পরিণত হয়।

কবি ইবনুল মু'তায বলেন,

خل الذنوب صغيرها+ وكبيرها ذاك التقى

واصنع كماش فوق+ أرض الشوك يحذر ما يرى

لا تحقرن صغيرة+ إن الجبال من الحصى

'ছোট বড় সব পাপ ছেড়ে দাও, কেননা এটাই তাকওয়া।'

যমিনের উপরে কাঁটাযুক্ত পথে চলা ব্যক্তির মতো চল, যে খুবই সতর্কতার সাথে দেখেশুনে পথ চলে।

তুমি ছোট মনে করে কোনো পাপকেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করো না।

তাই তো বাংলার কবি কবিতায় বলেন -

'ছোট ছোট বালি কণা বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল'

ছোট পাপ লাগাতার করলে এক পর্যায়ে ব্যক্তির গোটা জীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এমনকি সে পাপে আসক্ত হওয়ায় ইবাদতের স্বাদ, মজা হারিয়ে ফেলে। অন্তর পাপের কালিমায় কালো বিন্দুটে হয়। শয়তান তাকে তার অন্যতম সেবক বানায়। নিজেকে হারিয়ে ফেলে নিজের স্বকীয়তা, ব্যক্তিত্ববোধ থেকে। পাপের নিষিদ্ধ পথে চলে অভ্যস্ত হ ওয়ায় পুন্যের পথে চলার মতো সৎ সাহস ও মনোবাসনাকে বরাবরই হারিয়ে ফেলে পশ্চাদ্মুখী হয়ে পড়ে। পাপের বিষয়টি এমনই। লাগাতার পাপের প্রভাব এমনভাবেই চিন্তা, চেতনার জগৎ ছাড়াও বাহ্যিকভাবে ব্যক্তির প্রত্যেক সেক্টরে মারাত্মক প্রভাব ফেলে।

আবু হুরায়রা রা হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন -

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ فَإِنْ زَادَ زَادَتْ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ (كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

মুমিন ব্যক্তি যখন গুনাহ করে তখন তার কলবে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর সে তওবা করলে পাপকাজ ত্যাগ করলে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলে তার কলব পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। সে আরো গুনাহ করলে সেই কালো দাগ বেড়ে

[৮৩] *সহীহুল জামে, হা : ২৬৮৭*
[৮৪] *সহীহ বুখারী, হা : ৬৩০৮*
[৮৫] *ফাতহুল বারী-১১/৩৩৭*

যায়। এই সেই মরিচা যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন (অনুবাদ :) "কক্ষণো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং (মরিচা) ধরিয়েছে"।[৮৬]

০২. কবিরা গুনাহ তথা বড় পাপ : যে কোনো মুসলিমের ওপর আবশ্যকীয় দায়িত্ব কর্তব্য হলো যতদূর সম্ভব কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, সতর্ক থেকে পাপ ও পাপের নাগপাশ থেকে নিজেকে হেফাজত করা। কেননা কবিরা গুনাহর ব্যাপারে মারাত্মক শাস্তি, ধমক, অভিসম্পাৎ বর্ণিত হয়েছে। কবিরা গুনাহ কাকে বলে ?

কবিরা গুনাহর সংজ্ঞা, পরিচিতির ব্যাপারে ওলামার মধ্যে অনেক মত পাওয়া যায়। তবে সব মতের মূল কথা হলো - যে কাজের ক্ষেত্রে কুরআন বা হাদিসে মারাত্মক কঠোর ধমক, তিরস্কার, শাস্তি, আমল ধ্বংস এরূপ জাতীয় বক্তব্য পাওয়া যায় তাকে শরীয়তের পরিভাষায় কবিরা গুনাহ বলে।

✡ সবচেয়ে বেশি আমল ধ্বংসকারী কবিরা গুনাহসমূহ :

০১. শির্ক ও রিদ্দাহ :

শিরক হলো আসমানের নিচে জমিনের ওপরে সবচেয়ে বড় পাপ। যেই পাপের দ্বারা আদম সন্তান মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করে। যেই পাপ মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট, ঘৃণিত। যেই পাপের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তিনি (আল্লাহ) সব পাপ কিয়ামতের মাঠে ক্ষমা করে দিবেন, কিন্তু শিরকের পাপ ক্ষমা করবেন না যদি সে তওবা না করে মৃত্যুবরণ করে। মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী-

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন। আর যে-ই আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে এক মহাপাপ রটনা করে।[৮৭]

আরেক জায়গায় বলেন -

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না; আর তার থেকে ছোট যাবতীয় গোনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন, আর যে কেউ আল্লাহর সাথে শির্ক করে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।[৮৮]

এটিই একমাত্র পাপ যার ক্ষেত্রে স্বয়ং নবী- রাসূলগণকেও কঠোর হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে, যাতে করে এই পাপের কোনো গন্ধও যেন শরীরে না লাগে। যদি স্বয়ং নবী-রাসূলগণ শিরকের বেড়াজালে আটকে যায় তাঁদেরও সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে বলে মারাত্মক অশনি সতর্কবাণী শুনিয়েছেন মহান রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

'আর আপনার প্রতি ও আপনার পুর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী করা হয়েছে যে, 'যদি আপনি শির্ক করেন তবে আপনার সমস্ত আমল তো নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।[৮৯]

এজন্য প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ঈমানী দায়িত্ব কর্তব্য হলো শিরকমুক্ত জীবন গড়া। শিরকের পাপ থেকে সর্বদা নিজেকে গুটিয়ে রাখাকে জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করা। স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'আলা শান, ইজ্জতকে ভূলণ্ঠিত করে সৃষ্টিকে সম্মান, ইজ্জত দেয়া নিঃসন্দেহে এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অন্যায়, অপরাধ। তাই তো লোকমান (আ:) বলেছিল তাঁর ছেলেকে -

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

'আর স্মরণ করুন যখন লুকমান উপদেশ দিতে গিয়ে তার পুত্রকে বলেছিল, 'হে আমার প্রিয় বৎস! আল্লাহর সাথে কোনো শির্ক করো না। নিশ্চয় শির্ক বড় যুলুম।[৯০]

✡ কুফর ও রিদ্দার প্রকারসমূহ :

১) দ্বীন ও দ্বীনের অনুসারীদের সাথে তামাশা, ঠাট্টা, বিদ্রুপ করা-

[৮৬] *সূরা আল-মুতাফফিফীন, আয়াত : ১৪, তিরমিযী হা : ৩৩৩৪*
[৮৭] *সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৪৮*
[৮৮] *সূরা আন-নিসা, আয়াত :* ১১৬
[৮৯] *সূরা আয-যুমার, আয়াত :* ৬৫
[৯০] *সূরা লোকমান, আয়াত :* ১৩

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ০ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾

আর আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করলে অবশ্যই তারা বলবে, 'আমর। তো আলাপ-আলোচনা ও খেল-তামাশা করছিলাম। 'বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে বিদ্রুপ করছিলে?

তোমরা ওজর পেশ করো না। তোমরা ঈমান আনার পর কুফরী করেছ। আমরা তোমাদের মধ্যে কোনো দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেব---কারণ তারা অপরাধী।[৯১]

২) দ্বীনের যে কোনো বিষয় অপছন্দ করা-

আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে যারা দ্বীনের অনেক বিষয়কে মন থেকে ঘৃণা, অপছন্দ করে। এমনকি তাদের অনেকেই অকথ্য মন্তব্য, হাসি, মজা করে। অথচ দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে মজা, অপছন্দ করে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে চলা স্পষ্ট কুফরী। চাই সেই বিষয় ছোট হোক কিংবা বড় হোক। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন -

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾

এটা এজন্যে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করেছে। কাজেই তিনি তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন।[৯২]

৩) এমন অবাধ্যমূলক কাজ করা যে কাজে আল্লাহ রাগান্বিত হন এবং এমন কাজ করাকে অপছন্দ করা যে কাজে মহান আল্লাহ তা'আলা খুশি, সন্তুষ্ট হন-

এমন মানুষ সমাজে অনেক আছে, যারা দ্বিধাহীন চিত্তে আল্লাহর অবাধ্যমূলক কাজ, শরীয়তবিরোধী কাজে জড়িত হয়ে আল্লাহকে রাগান্বিত করে। সাথে সেই সকল ওয়াব, পুন্যের কাজ করতে অপারগতা প্রকাশ করে, এমনকি সেই সকল পুন্যের কাজ করতে অখুশি, বেজার হয়। যার ফলে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয়ভাজন না হয়ে অভিশপ্ত ব্যক্তিতে পরিণত হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন -

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾

'এটা এজন্যে যে, তারা এমন সব বিষয় অনুসরণ করেছে যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে এবং তারা তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছে ; সুতরাং তিনি তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন।[৯৩]

০২. রিয়া (ছোট শির্ক) :

الرياء তথা লৌকিকতা, মানুষ দেখানো কোনো কিছু করা। একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য যাবতীয় ইবাদত, পুন্যের কাজ না করে যখন ঐ ইবাদত বা কর্মের মুখ্য উদ্দেশ্যই থাকে লোক দেখানো তখন ঐ ইবাদত বা কর্ম আর একনিষ্ঠ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না বরং তা তার স্বকীয়তা হারায়। ফলে চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে দাঁড়ায় - রিয়া তথা লৌকিকতা। আর এটাই হলো ছোট শির্ক। যা মারাত্মক ভয়ানক। এ সম্পর্কে সহীহ হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন-'আমি শিরকের শরীক থেকে মুক্ত। যে এমন কোনো আমল করল যাতে শরীক আছে'

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিকে বিচারের জন্য পেশ করা হবে সে হবে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর নিকট নিয়ে যাওয়া হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে স্বীয় নে'আমতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। আর সেও তা স্মরণ করবে। তারপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এত নে'আমতের বিনিময়ে তুমি কী আমল করেছ? সে উত্তরে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, বরং তুমি লড়াই করেছ এজন্য যে, তোমাকে বাহাদুর বলা হবে। এমনকি তোমাকে তা বলাও হয়েছে। অতএব তার ব্যাপারে আদেশ করা হবে। তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

[৯১] *সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ৬৫-৬৬*
[৯২] *সূরা মুহাম্মদ, আয়াত : ৯*
[৯৩] *সূরা মুহাম্মদ, আয়াত : ২৮*

অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হবে, যে নিজে ইলম শিক্ষা করেছে ও অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন অধ্যয়ন করেছে। আল্লাহ তাকে তাঁর নে'আমত স্মরণ করাবেন এবং সেও তা স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, এ নে'আমতের জন্য তুমি কী আমল করেছ? সে বলবে আমি ইলম শিক্ষা করেছি এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন অধ্যয়ন করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এজন্য ইলম শিক্ষা করেছ, যেন তোমাকে বিদ্বান বলা হয় এবং এজন্য কুরআন পড়েছ যাতে তোমাকে ক্বারী বলা হয়। তোমাকে বিদ্বান ও ক্বারী বলা হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এমন ব্যক্তিকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হবে, যাকে আল্লাহ বিপুল সম্পদ দান করেছেন। আল্লাহ প্রথমে তাকে তার নে'আমতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সেও তা স্মরণ করবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করবেন এত নে'আমতের বিনিময়ে তুমি কী আমল করেছ? সে বলবে, যেসব ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ কর তা হাতছাড়া করিনি। তোমার সন্তুষ্টির জন্য সবক্ষেত্রেই সম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এজন্য দান করেছ যে, তোমাকে দানবীর বলা হবে। এমনকি তোমাকে তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে, তাকে উপুড় করে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[৯৪]

০৩. নবী ﷺ-এর আওয়াজের ওপর স্বর উঁচু করা :

নবী ﷺ-এর কথার ওপর কেউ কোনো কথা, আওয়াজ উঁচু করা তাঁর শানের অবমাননা করার শামিল এবং চরম ধৃষ্টতার অন্তভুক্ত। এমন স্বভাব রাসূলের সাথে বেয়াদবি করার নামান্তর। সাহাবীগণ রাসূলকে সর্বোচ্চ সম্মান, মর্যাদা দিয়ে চলেছেন। এমন কোনো কথা, কাজ যে কথা, কাজে তিনি কষ্ট পাবেন কিংবা তাঁর সম্মানে আঘাত হানে এমন স্বভাব, আচরণ থেকে তারা জোরালোভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতেন, বেঁচে থাকতেন। রাসূলের মজলিসের অন্যতম আদব ছিল তাঁর কোনো কথার ওপর কেউ উঁচু স্বরে কথা না বলা। কার সাথে কথা বলা হচ্ছে, কী বলা হচ্ছে তা সম্পর্কে সচেতন ছিল সাহাবীগণ। কারণ এর কমবেশি হলেই বেয়াদবির শামিল।

সাহাবি আনাস বিন মালেক ﷺ হতে, বর্ণিত তিনি বলেন- যখন এই আয়াত নাজিল হয়,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তার সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না; এ আশঙ্কায় যে, তোমাদের সকল কাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না।[৯৫]

তখন সাহাবী সাবেত বিন কায়েস বাড়িতে বসা ছিলেন। তিনি বলেন : আমি জাহান্নামী! এবং তিনি নবী ﷺ থেকে বিরত ছিলেন। নবী ﷺ সাহাবী সাদ বিন মুয়াজকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু আমর! সাবেতের কী হয়েছে? সাদ জবাবে বলেন, আমি জানি না তাঁর কী হয়েছে? পরে সাহাবী সাদ বিন মুয়াজ সাবেত বিন কায়েস-এর কাছে গিয়ে তার রাসূলের সাথে কথোপকথনের কথা বললে সাবেত বিন কায়েস বলেন : এই আয়াত আমার ব্যাপারে নাজিল হয়েছে, আমি জানি আমি রাসূলের কথার ওপর উঁচু আওয়াজ করেছি, অতএব আমি জাহান্নামী। এই কথা সাদ বিন মুয়াজ রাসূলের কাছে পেশ করলে রাসূল ﷺ অভয় বাণী শুনিয়ে সুসংবাদ দিয়ে বলেন : বরং সে জান্নাতী।

সাদ বিন মুয়াজ বলেন : এরপর থেকে আমরা তাঁকে আমাদের মাঝে বিচরণশীল জান্নাতী মনে করতাম।[৯৬]

একটু চিন্তা করুন! সাহাবী ﷺ-এর অবচেতন মনে স্বাভাবিক গতির একটু বেশি আওয়াজ হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। এজন্য তিনি নিজেকে ধিক্কার জানিয়ে বিষণ্ন, ভারাক্রান্ত মনে নিজ অপরাধের অন্তর্জালের আগুনে প্রজ্বলিত হন। আমাদের সামনে অহরহ রাসূলের সুন্নাহ তথা হাদিস উপস্থাপন হওয়ার পরও অনেকেই বিভিন্ন অযুহাত, যুক্তি পেশ করে রাসূলের হাদিসকে বর্জন করে তাহলে এখন চিন্তা করুণ এটা কি কোরআনের আয়াতের দৃষ্টিতে বড় ধরনের ধৃষ্টতা, মূর্খতা, গোড়ামী নয়? ❐❑

[৯৪] *সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত হা : ২০৫; বাংলা মিশকাত হা : ১৯৫ 'ইলম' অধ্যায়*

[৯৫] *সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত : ২*

[৯৬] *সহীহ বুখারী, হা : ৩৬১৩, সহীহ মুসলিম, হা : ১১৯*

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন (১) এক সালামে চার রাকাতবিশিষ্ট সুন্নাত সালাত, যা আমরা যোহরের পূর্বে পড়ি তা কি সঠিক নাকি ভুল? জানাবেন ইনশাআল্লাহ।

ইবরাহীম বিন মজিবুর রহমনা, সদরপুর, ফরিদপুর

উত্তর যোহরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত নামায পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদার অন্তর্ভুক্ত। নবী ﷺ এ চার রাকআত কখনো ছাড়তেন না। যেমন হাদীসে এসেছে :

عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ.

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যোহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাকআত ও ফজরের আগে দু' রাকআত নামায কখনো ত্যাগ করতেন না।[১]

উক্ত চার রাকআত সুন্নাত পড়ার পদ্ধতি:

উক্ত চার রাকআত সুন্নাত নামায দু সালামে অর্থাৎ দু'রাকআত-দু'রাকআত করে পড়া অধিক উত্তম। কেননা হাদীসে এসেছে, ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন :

صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى.

"দিন ও রাতের নামায দুই দুই রাকআত।"[২]

অর্থাৎ রাত ও দিনের নফল (ফরয ছাড়া অন্য সকল নামায) দু রাকআত করে পড়াই উত্তম।

তবে যদি দু তাশাহুদ ও এক সালামেও পড়া হয় তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। এক সাথে চার রাকআত পড়ার ব্যাপারে পূর্ববর্তী সালাফদের বক্তব্য ও আমল পাওয়া যায়।

প্রশ্ন (২) *আসসালামু আ'লাইকুম, চাকরীর সুবাদে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে থাকাকালীন সময়ে হানাফি মাযহাবের ভাইদের সাথে মাঝে মাঝে তাবলীগ জামাতে তিন দিন করে সময় লাগিয়েছিলাম; যেখানে তিন তসবিহ্ (প্রতিদিন সকাল-বিকাল সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহ আকবার ১০০ বার, যে কোনো দরুদ ১০০ বার এবং আসতাগফিরুল্লাহ্ ১০০ বার) নামে একটি আ'মল শিক্ষা দেওয়া হয়, যা এখনও চালিয়ে যাচ্ছি। এই আমলটি ইসলামের দৃষ্টিতে সহীহ কিনা জানালে উপকৃত হব।*

এম,এস, ইসলাম ময়মনসিংহ্

উত্তর আপনি যিকিরের বাক্যগুলো উল্লেখ করেছেন, সেগুলোকে সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে সর্বোত্তম যিকির বা কালেমা বলা হয়েছে।[৩] কিন্তু আপনি এগুলো সকাল-বিকালের আমলের জন্য ১০০ বারের যেই নিসাবের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাবলীগের লোকেরা যেটা আপনাকে শিখিয়েছেন, সেটা সহীহ হাদীছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আপনার জন্য ভালো হবে এগুলো পরিত্যাগ করে একটি হিসনুল মুসলিম বই সংগ্রহ করে তাতে উল্লেখিত যিকির-আযকারগুলো মুখস্ত করুন। সেখানে সকাল-বিকালের আমলের বিভিন্ন নিসাব দেওয়া আছে এবং সেগুলো পাঠ করার সওয়াবের কথাও উল্লেখ আছে।

প্রশ্ন (৩) *আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামি আলোচনা এবং ওয়াজ নসিহত শোনার সময় কিংবা জুমআর খুতবা শ্রবণ করার সময় বক্তাদের দু'আমূলক বাক্য শুনে শ্রোতারা সম্মিলিত কণ্ঠে উঁচু আওয়াজে বলে। আবার কিছু কিছু বক্তা শ্রোতাদেরকে বলার আদেশ করে। ফলে শ্রোতা উঁচু আওয়াজে আমীন বলে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এসকল ইসলামি আলোচনা এবং ওয়াজ নসিহত শোনার ক্ষেত্রে উল্লেখিত দো'আ শুনে আমিন বলা যাবে কি?*

এম, এস,আই মন্ডল, ময়মনসিংহ।

উত্তর বক্তা বা খতীবের দু'আমূলক বাক্য শুনে মনে মনে আমীন বলাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু উঁচু আওয়াজে সম্মিলিত কণ্ঠে আমীন বলা শরীয়তসম্মত নয়। কেননা চিৎকার করে দু'আ-যিকির পাঠ করতে নবী ﷺ নিষেধ করেছেন। এক সফরে সাহাবীগণ যখন আল্লাহর যিকির করার সময় তাদের আওয়াজ উঁচু করলেন তখন তিনি বললেন,

---

[১] *সহীহ বুখারী, হা : ১১৮২*

[২] *সুনান আবু দাউদ অধ্যায়- ২/ সালাত (নামায) (كتاب الصلاة) হাদীস নম্বর-১২৯৫ ইসলামিক ফাউন্ডেশন। তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজাহ প্রমূখ-সনদ সহীহ*

[৩] *সহীহ মুসলিম, হা : ২১৩৭*

أَيُّهَا النَّاسُ! اِرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"হে লোকসকল! তোমরা নিজেদের জন্য সহজপন্থা অবলম্বন করো। কেননা তোমরা তো বধির বা দূরে অবস্থানকারী কাউকে আহ্বান করছো না। যাকে তোমরা আহ্বান করছো তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা এবং অতি নিকটে। তোমাদের কেউ বাহনে আরোহণ করা অবস্থায় তার বাহনের ঘাড়ের যত নিকটবর্তী থাকে, তোমরা যাকে আহ্বান করছো, তিনি তার চেয়েও আহ্বানকারীর অধিক নিকটে"।[৪]

আর বক্তা যদি শ্রোতাদেরকে স্বজোরে আমীন বলার আহব্বান জানায়, তাহলে এটা আরো জঘন্য বিদআত গণ্য হবে।

☞ প্রশ্ন (৪) *খ্রিষ্টান মিশনারী স্কুলে পড়ালেখা করা কি জায়েজ? এবং খ্রিস্টানদের চিহ্নসম্বলিত ইউনিফর্ম পরিধান করার বিধান কী?*

গোলাম রাব্বি, বরিশাল

উত্তর খ্রিষ্টানদের যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অথবা মিশনারী স্কুলে দুনিয়াবী বিষয়ে উপকারী ও ভালো শিক্ষাদান করা হয় এবং শিক্ষার্থীর দ্বীন ও আকীদাহ নষ্ট হওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকে না, তাতে লেখা-পড়া করা কিংবা সন্তানদেরকে ভর্তি করা বৈধ। তবে তা এড়িয়ে চলাই উত্তম। কেননা এখানে শিক্ষাগ্রহণকারী ফিতনায় পতিত হওয়া থেকে নিরাপদ নয়। আর যদি তাদের যেসব প্রতিষ্ঠানে ইসলামবিরোধী রীতি-নীতি চাপিয়ে দেওয়া হয়. তাতে ভর্তি হওয়া অবৈধ। যেমন আপনি খ্রিষ্টানদের চিহ্নসম্বলিত ইউনিফর্ম পরিধান করার কথা উল্লেখ করেছেন।

☞ প্রশ্ন (৫) *আমাদের এলাকার এক মুসল্লি মসজিদ ও মাদ্রাসার সেক্রেটারি বরাবর কিছু সম্পত্তি লিখে দিয়েছেন এই শর্তে যে, সম্পদদাতা আজীবন মসজিদ ও মাদ্রাসার সভাপতি থাকবেন এবং তার বংশানুক্রমিক সভাপতি থাকবে। কোরআন ও হাদিস অনুযায়ী তার দান সঠিক কিনা জানতে চাই এবং ওই মসজিদের সালাত হবে কিনা?*

আশা করছি কোরআন ও সুন্নাহ থেকে দলিলভিত্তিক উত্তর প্রদান করে উপকৃত করবেন। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

মো : সোহেল আহম্মদ- গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর এরকম শর্ত করে মসজিদ-মাদরাসায় জমি-জমা দান করাটা ঠিক নয় বলে মনে করি। কারণ, এতে করে পরবর্তীতে তার বংশের এমন লোকও মসজিদ বা মাদরাসার সভাপতি, কর্ণধার কিংবা মুতাওয়াল্লী হয়ে যাবে, যে এসব প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান নিয়ে পরবর্তীতে ঝগড়া ও দলাদলি হতে পারে এবং এগুলোর দ্বারা আশানুরূপ ফল পাওয়া নাও যেতে পারে। তাই শর্ত করে দান করার চেয়ে বিনা শর্তে দান করাটাই অধিক নিরাপদ। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত)

☞ প্রশ্ন (৬) *আমি একজন জমি ব্যবসায়ী। আমার কাজ হলো বিনা-পুঁজিতে প্রকৃত জমি মালিকের সাথে নির্দৃষ্ট একটি মূল্য চুক্তি করে বেশি টাকায় বিক্রি করি। যেমন আমি মালিককে বলি আপনাকে জমিটি বিক্রি করে দিব আপনি পাবেন জমির মূল্য ১০ লক্ষ টাকা আর এই মূল্যের থেকে অতিরিক্ত যা বিক্রি হবে তা আমার। কিন্তু শর্ত হলো আমি আপনার কাছে সরাসরি গ্রাহককে উপস্থিত করব আপনি তার সাথে ১৩ লাখ টাকা জমির মূল্য নির্ধারণ করবেন। এবং সম্পূর্ণ টাকা আপনার হাতে বুঝে নিবেন। ক্রেতা জানবে জমির মূল্য ১৩ লাখ টাকা আর আপনি পাবেন ১০ লাখ টাকা। পরবর্তীতে চুক্তি অনুপাতে ক্রেতার অজান্তে অবশিষ্ট ৩ লাখ টাকা আমি গ্রাহক সংগ্রহ করে দেওয়ার ব্রোকার হিসেবে কিংবা পারিশ্রমিক হিসেবে গ্রহণ করব। এক্ষণে আমার প্রশ্ন হলো, উক্ত পদ্ধতিতে এই ৩ লাখ টাকা গ্রহণ করা আমার জন্য বৈধ হবে কি? দৃষ্টান্তসহ সহীহ দলিল দ্বারা জানিয়ে বাধিত করবেন।*

মো: আব্দুল্লাহ, রংপুর

উত্তর ইসলামে শ্রমের বিনিময়ে মজুরী গ্রহণ করা বৈধ। ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করার ক্ষেত্রেও শ্রম দিতে হয়। তাই বিক্রেতার কাছ থেকে বিক্রয় করে দেওয়ার পারিশ্রমিক নেওয়া বৈধ এবং ক্রেতাকে কিনে দেওয়ার বিনিময়ে তার কাছ থেকে

[৪] *সহীহ বুখারী, হা : ২৯৯২ ও সহীহ মুসলিম, হা : ৭০৩৭*

পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয আছে। এমনকি একই বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের কাছ থেকে মধ্যস্থতা করার বিনিময় গ্রহণ করাও অবৈধ নয়। তবে শর্ত হচ্ছে মধ্যস্থতাকারীকে উভয়ের জন্যই কল্যাণকামী হতে হবে এবং কোনো প্রকার মিছামিছি ও ধোকাবাজি চলবে না। মধ্যস্থতাকারী যদি মিথ্যার আশ্রয় নেয় কিংবা কোনো এক পক্ষকে অথবা উভয় পক্ষের সাথে প্রতারণা করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং তার ইনকাম হারাম হবে। কেননা রাসূল ﷺ কলেছেন,

«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»

"যে ব্যক্তি আমাদের সাথে ধোকাবাজি করবে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়"।[৫]

☞ প্রশ্ন (৭) *আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব ফরজ সলাত শেষে সালাম ফিরিয়ে সম্মিলিত মুনাজাত শুরু করেন। এতে আসরের সালাতে পেছনের সারির মুসল্লিদের যাদের ২, ৩ বা ১ রাকআত সলাত ছুটে গেছে, তারা ইমাম সাহেবের মাইকে মুনাজাতের শব্দের জন্য বাকী সলাত আদায় করতে বিঘ্ন ঘটে; ভুল ভ্রান্তিও হয়। ইমাম সাহেব এই অভ্যাস ছাড়তে নারাজ। তিনি বলেন, পূর্ব থেকে এ প্রথা চালু আছে, তাই তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন। মুসল্লিদের এ ভোগান্তির দায় কি ইমাম সাহেবের ওপর বর্তাবে, না মসজিদ কমিটিকেও বহন করতে হবে? কুরআন সুন্নাহর আলোকে মতামত জানাতে অনুরোধ করছি।*

(মো: গিয়াস উদ্দীন, ৭০২, ইব্রাহিমপুর, ঢাকা- ১২০৬)

উত্তর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

"তোমাদের রবকে ডাকো কান্নাজড়িত কণ্ঠে ও চুপে চুপে, অবশ্যই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না"।[৬] এটিই হচ্ছে দু'আ করার মূলনীতি। নিরবে ও বিনয়ের সাথে দু'আ করতে হবে। উঁচু আওয়াজে নয় এবং সম্মিলিত কণ্ঠেও নয়। সেই সঙ্গে ইমাম সাহেবের মাইকে উঁচু আওয়াজের কারণে যদি মাসবুক মুসল্লিদের সালাতে সমস্যা হয়, তাহলে অন্যের সালাতে ব্যাঘাত ঘটানোর কারণে সে গুনাহগার হবে।

[৫] *সহীহ মুসলিম, হা : ৪৩*
[৬] *সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত : ৫৫*

☞ প্রশ্ন (৮) *আমাদের দেশে ফজরের ফরজ সলাতের সালাম ফিরানোর পর কোনো কোনো ইমাম 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম, হাইয়েনা রব্বানা বিস সালাম, তাবারাকতা ইয়া জালজালালি ওয়াল ইকরাম- এই দোয়া সশব্দে পাঠ করেন। দোয়াটি শুদ্ধ কিনা জানতে চাই। হাদীসে 'হায়েনা রব্বানা বিস সালাম অংশটি নাই। কোন হাদীসে এটি আছে জানতে চাই।*

(মো: গিয়াস উদ্দীন, ঢাকা)

উত্তর রাসূল ﷺ সালাম ফিরানোর পর তিনবার আসতাগফিরুল্লাহ বলতেন। অতঃপর তিনি উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন। হাদীসে দু'আটি এভাবে এসেছে,

اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

কিন্তু "হাইয়েনা রাব্বানা বিস সালাম, তাবারাকতা ইয়া জালজালালি ওয়াল ইকরাম" এই অংশটি সালাম ফিরানোর পরের দু'আ হিসেবে সাব্যস্ত নয়।[৭]

☞ প্রশ্ন (৯) হজ্জের ইচ্ছা করার পর কেউ যদি কোনো কারণে যেতে না পারে তাহলে করণীয় কী?

(মো : ইলিয়াস, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ)

উত্তর এ ক্ষেত্রে কোনো কিছুই তার ওপর আবশ্যক হবে না। কোনো লোক হজ্জের ইহরামে প্রবেশ করার আগেই বাধাপ্রাপ্ত হলে কিছুই আবশ্যক হবে না। তবে বাধা দূর হলে বিলম্ব না করে হজ্জ আদায় করে নেওয়া উচিত।

আর ইহরামে প্রবেশ করার পর তথা হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হওয়া এমনকি ইহরাম বাঁধার পর বাধাগ্রস্থ হলে যদি ইহরাম বাঁধার সময় শর্ত করে থাকে এই বলে, "আল্লাহুম্মা ইন্ হাবাসানী হাবেসুন্, ফামাহিল্লী হাইছু হাবাস্তানী", তাহলে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার স্থানে ইহরাম খুলে ফেলবে। তার ওপর কোনো কিছুই আবশ্যক হবে না। কিন্তু যদি শর্ত না করে থাকে, তাহলে উক্ত বাধা অচিরেই বিদূরিত হওয়ার আশা থাকলে অপেক্ষা করবে এবং হজ্জ পূর্ণ করবে। আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে যদি বাধামুক্ত হয়, তাহলে আরাফাতে অবস্থান করে হজ্জ পূর্ণ করবে। কিন্তু আরাফাতে অবস্থানের

[৭] *সহীহ মুসলিম, হা : ৫৯১*

পর বাধামুক্ত হলে হজ্জ ছুটে গেল। তখন উমরা আদায় করে ইহরাম খুলে ফেলবে। ফরয হজ্জ হয়ে থাকলে পরবর্তী বছর তা কাযা আদায় করবে। কিন্তু অচিরেই বাধামুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে এবং শর্ত না করে থাকলে ইহরাম খুলে ফেলবে এবং কুরবানী করে দিবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾

তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ এবং উমরা পূর্ণ করবে। যদি বাধাগ্রস্ত হও, তাহলে সহজসাধ্য কুরবানী করবে।[৮]

প্রশ্ন (১০) ***স্ত্রীকে বিবাহের মোহর পরিশোধ করার আগেই যদি স্বামী মারা যায়, তাহলে মোহরের কী হবে? স্ত্রীর মৃত স্বামীর মোহর কে দিবে বা কোথা থেকে নিবে?***

(গোলাম রাব্বি বরিশাল)

উত্তর বিবাহের মোহর হচ্ছে সম্পূর্ণ স্ত্রীর হক। স্বামীর ওপর তা আদায় করা আবশ্যক।

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾

তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্ট চিত্তে দিয়ে দাও। তবে তারা খুশী মনে মোহরের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ করো।[৯] এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্ত্রীকে মোহর না দিয়ে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী মোহর কোথা থেকে নিবে?

এর জবাবে আমরা বলবো যে, স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদ ভাগ করার আগেই সেখান থেকে স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করতে হবে। অতঃপর বাকী সম্পদ ওয়ারিসগণ ভাগ করে নিবে।

প্রশ্ন (১১) ***মাসিক বেতনের যাকাত কিভাবে প্রদান করতে হবে?***

(মো : সাইকুল ইসলাম, রহনপুর, চাপাই নবাবগঞ্জ)

উত্তর এক্ষেত্রে সুন্দর পন্থা হচ্ছে, প্রথম বেতনের যখন এক বছর পূর্ণ হবে তখন তার সমস্ত বেতনের যাকাত আদায় করে দিবে। যে বেতনে একবছর পূর্ণ হয়েছে তার যাকাত সময়ের মধ্যেই আদায় করা হলো। আর যাতে বছর পূর্ণ হয়নি তার যাকাত অগ্রীম আদায় হয়ে গেল। আগ্রীম যাকাত দিতে মানা নেই। প্রতি মাসের বেতনের যাকাত আলাদাভাবে হিসাব করে আদায় করার চেয়ে এটাই সহজ পন্থা। কিন্তু দ্বিতীয় মাসের বেতন আসার আগেই যদি প্রথম মাসের বেতন খরচ হয়ে যায়, তবে তার ওপর কোনো যাকাত নেই। কেননা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হচ্ছে বছর পূর্ণ হওয়া।

প্রশ্ন (১২) ***জুমআর দিন মুআয্যিন দ্বিতীয় আযান দেয়ার সময় কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে করণীয় কী? সে কি তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়া শুরু করে দিবে নাকি মুআযযিনের জবাব দিবে?*** ***(হাফিজুর রহমান)***

উত্তর আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, কোনো লোক জুমআর দিন মসজিদে প্রবেশ করে যখন দেখবে মুআয্যিন দ্বিতীয় আযান দিচ্ছে তখন সে তাহিয়্যাতুল মসজিদ শুরু করবে, মুআয্যিনের আযানের জবাব দিতে ব্যস্ত হবে না। যাতে করে খুতবা শোনার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে। কেননা খুতবা শোনা ওয়াজিব আর আযানের জবাব দেয়া সুন্নাত। অতএব সুন্নাত আদায় করতে গিয়ে ওয়াজিব বর্জন করা যাবে না।

প্রশ্ন (১৩) ***মোবাইলের মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করা কি জায়েয? মোবাইলে ঝাড়-ফুঁকের দু'আগুলো রেকর্ড করে মোবাইলে পাঠিয়ে দিলে কি রোগী তা দ্বারা উপকৃত হবে?***

উত্তর ঝাড়-ফুঁকের ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে, নিজের শরীরে নিজেই ঝাড়-ফুঁক করবে। নিজের সন্তানদেরকে নিজেই ঝাড়-ফুঁক করবে। এটাই ঝাড়-ফুঁকের সর্বোত্তম পদ্ধতি। রাসূল ﷺ তাঁর নিজের শরীরে নিজেই ঝাড়-ফুঁক করতেন এবং তাঁর নাতী হাসান-হুসাইনকেও তিনি নিজেই ঝাড়-ফুঁক করতেন। ইবরীম আলাইহিস সালাম তার ছেলে ইসমাঈলকে ঝাড়-ফুঁক করতেন। তবে ঝাড়-ফুঁকের দু'আ মুখস্ত ও তা পাঠ করার পদ্ধতি জানা না থাকলে অন্যের কাছে যাওয়া এবং অন্যকে দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করানো জায়েয আছে।[১০]

[৮] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৯৬*
[৯] *সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৪*
[১০] *সহীহ মুসলিম, হা : ২১৮৬*